হইয়া বিবিধ রোগকে আনয়ন করে। বলা বাহুল্য, এই জন্যই ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তি শেষ পর্য্যন্ত ক্ষয়, ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি বিবিধ রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, এইরূপ চিকিৎসা-বিভ্রাটের জন্য সকল সময় চিকিৎসকগণ দায়ী নহেন। অনেক অভিভাবকও রোগীর জ্বর নিবারণ জন্য ঈদৃশ চিকিৎসার বিশেষ পক্ষপাতী। এই দোষের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র ঔষধ প্রয়োগ করার একটী নির্দ্দিষ্ট কাল নির্ণয় করিয়াছেন যথা—

মৃদৌজ্বরে লঘৌ দেহে প্রচলেষু মলেষু চ
পক্বং দোষং বিজানীয়াৎ জ্বরে দেয়ং তদৌষধং।
ক্ষুৎক্ষামতা লঘুত্বঞ্চ গাত্রানাং জ্বর মার্দ্দবং।
দোষ প্রবৃত্তিরষ্টাহো নিরাম জ্বর লক্ষণং॥

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, ম্যালেরিয়ার স্বরূপ প্রবন্ধে যে সকল কথা বলা হইল, তাহার সমস্তই হিন্দুশাস্ত্র ও চিকিৎসা বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া আমরা অবগত আছি। অতএব ইহাতে কোন শাস্ত্র বিরুদ্ধ কথা প্রকাশিত হইয়া থাকিলে কোন চিকিৎসক বা কোন অভিজ্ঞ লোক তাহার যথামথ প্রতিবাদ করিলে আমরা সুখী হইব। আর যদি আমাদের উক্তিই অভ্রান্ত বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করেন, তাহা হইলে আমাদের সঙ্কেত মত যাহাতে চিকিৎসা কার্য্য সমাপিত হয় এবং রোগীগণও সতর্ক হইতে পারেন তৎপক্ষে আমাদের পাঠক এবং চিকিৎসক মণ্ডলী চেষ্টা করিলে আমরা সুখী হইব। তবে আজকাল অস্বাভাবিকভাবে জ্বর চিকিৎসা করিবার যে মত প্রবল ভাবে সমাদৃত হইতেছে তাহাতে আমাদের মতের কোন রূপ আলোচনা অরণ্যে রোদনবৎ হইবে বলিয়াই আমাদের মনে এক আশঙ্কা উপস্থিত হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে আর এ কথাও বলা আবশ্যক বলিয়া মনে করি, আজকাল পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান তারস্বরে ঘোষণা করিতেছে যে, এনোফেলিস মশকই ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ। কেননা তাহার দংশনে শরীর মধ্যে একপ্রকার ম্যালেরিয়া রোগের বীজাণু প্রবিষ্ট হয়। বলা বাহুল্য আমরা ও যে এ মতের সমর্থন একেবারে করিনা তাহা নহে। কারণ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও মশক কর্ত্তৃক রোগ-বীজাণু আনয়নের কথারও উল্লেখ আছে। তবে ডাক্তার বাবুরা যে ভাবে মশা ব্যাচারীদের দায়ী করেন, আমরা তেমন করি না। আমরা বলি, যে যে কারণে আমাদের শরীরে দোষ উৎপন্ন হয়, এনোফেলিস মশক তাহার অন্যতম। জল বায়ু দূষিত না হইলে এই মশক জন্মাইতেই পারে না। সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে, ইহারা দুষিত বায়ুতে জন্ম গ্রহণ করিয়া জল বায়ুর ন্যায় মানব শরীরে দোষ বা রোগ-বীজাণু জন্মাইবার সহায়তা করিয়া থাকে। ফলতঃ ইহারা ইহাদের মুখ নিঃসৃত বিষাক্ত লালা দ্বারা শরীরে বিষই প্রবেশ করাইয়া দেয়, কিন্তু যে তাপ দ্বারা জ্বরের অনুভূতি হয়, এনোফেলিস মশক সেই তাপ বা তাহার বীজ আনয়ন করে না। সেই তাপ আমাদের দেহেরই নিজস্ব সম্পত্তি, তাহার নাম পিত্ত। এনোফেলিস মশক, অযথা আহার বিহার, ঋতুবিপর্য্যয় প্রভৃতি

যে কোন কারণেই দেহ-দোষ উৎপন্ন হউক না কেন, আমাদের দেহস্থিত পিত্তাগ্নি উত্তেজিত হইয়া তাহার ক্ষালন অথবা পরিপাক ক্রিয়ার জন্য চেষ্টা করে এবং এজন্য পিত্ত অবস্থা-বিশেষে নিজ তাপের মাত্রা (temperature) বৃদ্ধি করে। বলা বাহুল্য, তাপের এই মাত্রাধিক্যের নামই জ্বর। সুতরাং ইহা বেশ বুঝা যায়, এনোফিলিস মশক জ্বর আনয়ন করে না। তবে যে অসংখ্য কারণে জ্বর হইয়া থাকে, এই মশক তাহার অন্যতম প্রবল কারণ মাত্র। আয়ুর্ব্বেদ বলেন যে, এক জাতীয় মশক দংশনে কুষ্টব্যাধি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। শুধু মশক কেন, মাকড়সা, সরীসৃপ জন্তু প্রভৃতির দংশনেও আমাদের বায়ু, পিত্ত ও কফ দূষিত ও কুপিত হইয়া বিবিধ রোগ জন্মিতে পারে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় বর্ত্তমান দেশ, কাল ও পাত্র মাহাত্ম্যে এইরূপ ম্যালেরিয়া বা বিষম-জ্বর উপস্থিত হওয়ার কারণ যথেষ্ট। যে হেতু আমাদের হাবভাব, চালচলন, আহার-ব্যবহার, ধর্ম্ম ও সমাজ প্রভৃতি নিয়তই আমাদের প্রাণাগ্নির ক্ষয় ও তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী দোষত্রয়ের প্রকোপ কল্পে সহায়তা করিতেছে। সুতরাং ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদ সাধন করিতে হইলে প্রাণাগ্নির শক্তি ও দোষত্রয়ের সাম্যাবস্থার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

নিদ্রা তত্ত্ব।

[শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ]

যাদেবী সর্ব্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা—
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

সূর্য্যকে দেখিতে যেমন প্রদীপ জ্বালিতে হয়না; নিদ্রাকে জানিতেও তেমনই কোন যুক্তিতর্কের আবশ্যক নাই। নিদ্রা আমাদের সকলেরই সুপরিচিত। তাঁর আশ্রয় ভিন্ন কাহারও গত্যন্তর নাই। আহারের ন্যায় নিদ্রাও যে মানুষের সুখ, দুঃখ, পুষ্টি, কার্শ্য, বলাবল, বৃষতা, ক্লীবতা, জ্ঞান ও অজ্ঞান জীবন ও মরণের কারণ হইয়া থাকে—ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ সত্য। বিশেষজ্ঞগণ ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। অতএব প্রত্যেক স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তির খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে জ্ঞান থাকা যেমন প্রয়োজন, নিদ্রাবিষয়েও তদ্রূপ জ্ঞান আবশ্যক। আমাদের জীবনের প্রায় একতৃতীয়াংশ যাঁর সেবায় অতিবাহিত হয়, শরীরের প্রত্যেক অণু পরমাণু পর্য্যন্ত যাঁ'র স্নেহবিন্দু পানে বঞ্চিত হয় না, যিনি পথশ্রান্ত পথিকের সকল শ্রান্তি ক্ষণিকের মধ্যে বিতাড়িত ক'রে অনির্ব্বচনীয় শান্তির ক্রোড়ে

নিয়ে যান, যাঁর স্পর্শনে শোকাতুরা জননীর আকুল ক্রন্দন সহসা যেন কোথায় অন্তর্হিত হ'য়ে যায়, রোগের যন্ত্রণায় রোগী ছটফট্ করিতেছে—বৈদ্যের শতশত ঔষধ বিফল হ'য়ে গেল—জীবন যায় যায়—সকলে হতাশ-প্রাণে ভগবানের করুণা ভিক্ষা করিতেছে, এমন সময়ে যাঁর আগমন-বার্ত্তা দর্শকবৃন্দের শুষ্কমুখে হাসি ফুটিয়ে তোলে, যাঁর অগাধকরুণায় আমরা প্রতিদিন নবজীবন লাভ করি, সেই অসামান্য শক্তি-সম্পন্না নিদ্রা জিনিষটা কি তাহা আমরা ভাবিয়া দেখিনা। ভাবিলে ভগবৎ শক্তির মাহাত্ম্য দেখিয়া আনন্দে বিভোর হইতে হয়। কিন্তু হায়! আমরা স্বেচ্ছায় সে রসে বঞ্চিত।

নিদ্রাকে কেবল শারীরিক চেষ্টা-বিশেষ ব'লে জা'নলেই সম্যক্ জানা হয় না। তাঁকে জানিতে হইলে যিনি তাঁর অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, যাঁর ইচ্ছায় এবং যাঁর শক্তি নিদ্রারূপে জীব দেহে কার্য্য করে তাঁকে জানিতে হয়। যিনি সেই সর্ব্বজ্ঞ মূলকর্ত্তাকে নিজের হৃৎপদ্মে স্থান দিতে সমর্থ হন তাঁ'র অজ্ঞেয় কিছু থাকেনা ; তাঁকে জানাই সম্যক্ জানা হয়। সেই দেবতার অনুগ্রহ প্রাপ্ত মানুষই একমাত্র সত্য আবিষ্কার করিতে সক্ষম এবং সেই সত্যই ত্রিকালে অব্যাহত থাকে; অতএব আমি সেই দেবতাবিষ্ট ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের আবিষ্কৃত সত্য যাহা নিদ্রাধিষ্ঠাতৃ দেবতার বাণীরূপে ঋষিগণের হৃদয়ে সংপ্রকাশিত হয়েছিল তাহাই যথাসাধ্য প্রকাশ করিয়া আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

জাগতিক কোন পদার্থই নিয়ত সুখ বা দুঃখ দিতে পারেনা। ভগবান্ যাহা কিছু দিয়াছেন তাহার এমন একটী মাত্রা ও অবস্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন যে, ঠিক সেই মাত্রায় ও অবস্থায় প্রযুক্ত হইলে তাহা সুখাবহ হইবে ; নতুবা দুঃখ দিবে। অন্ন যেমন সাক্ষাৎ প্রাণস্বরূপ হইয়াও অযুক্তি-যুক্ত প্রয়োগে জীবন-নাশের কারণ হয়—যে বিষকে যমের অনুচর ব'ল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না, সেই বিষও যেমন অবস্থা-ভেদে যুক্তিযুক্তভাবে প্রযুক্ত হইলে মৃত্যুর মুখ থেকে ছিনিয়ে এনে দেয়, সেইরূপ প্রত্যেক পদার্থেই হিতাহিত সুখদুঃখ ওতঃ-প্রোত ভাবে বিদ্যমান্। মানুষ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যে অনভিজ্ঞতা অথবা জ্ঞান সত্ত্বেও কার্য্যে সামর্থ-হীনতা অথবা স্মৃতির অভাব বশতঃই রোগ বা দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। আমরা যদি আর্য্য ঋষিগণের উপদেশ মত কার্য্য করিতে পারি, তাহাহইলে যে, নীরোগী হইয়া সুখে দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারিব তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। ভগবান্ নিদ্রাকে আমাদের দেহের ক্ষয় পূরণ করিতে, স্নিগ্ধতা সম্পাদন করিতে এবং সকল ধাতুর আদি যে রস ধাতু তাহাকে বর্দ্ধিত করিতে অনুমতি এবং তদুপযুক্ত শক্তি দিয়ে পাঠা'য়েছেন। সে তাহা করিবেই। যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে, সে দগ্ধ করিবেই, তাহার দ্বারা আপনি প্রয়োজন মত ভাল মন্দ উভয় কাজই করাইতে পারেন; সেইরূপ নিদ্রার যাহা কর্ত্তব্য সে তাহা করিয়া যাইবে, আপনি যদি তাহাকে প্রয়োজন অনুযায়ী কার্য্যে লইতে পারেন তাহা হইলেই নিদ্রা সুখপ্রদ হ'বে, নতুবা নয়। মনে করুন আপনার শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হইয়াছে, অর্থাৎ দেহে যে পরিমাণ জলীয়াংশ স্বাস্থ্যের অনুকূল—তাহার অধিক হইয়াছে, সে অবস্থার যদি আপনি দিবা

নিদ্রা যান তাহা হইলে নিদ্রাত দেখিবে না যে আপনার শ্লেষ্মা অধিক আছে, কাজেই তাহার যাহা কার্য্য শ্লেষ্মা বৃদ্ধি করা, তাহা করিল এবং তাহার ফলে আপনাকে শয্যাশায়ী হইতে হইল। এই যে আপনার কষ্ট ভোগ তাহার জন্য নিদ্রা দায়ী নহে, দায়ী আপনার কর্ম্ম এবং তাহার মূলে জ্ঞানের অভাব।

নিদ্রা অকালে, অতিমাত্রায় বা অল্পমাত্রায় সেবিত হইলে অথবা একেবারেই সেবিত না হইলে নানারূপ রোগের উৎপত্তি হয় এবং সত্বরই আয়ুষ্কাল শেষ হইয়া থাকে। লক্ষ্মণ যে দ্বাদশ বৎসর অনিদ্রায় ছিলেন তাহা অলৌকিক অথবা অভ্যাস ও সাধনাসাধ্য।

আমরা সাধারণতঃ উত্তম ও অধম ভেদে নিদ্রার দুই প্রকার অবস্থা দেখিতে পাই। প্রথমতঃ উত্তম অর্থাৎ গাঢ় নিদ্রা, যাহাতে চিত্তবৃত্তি একেবারে অন্তর্হিত হয়, কোনরূপ স্বপ্ন পর্য্যন্ত থাকে না, ইহাকেই সুষুপ্তি বলে। যে নিদ্রায় স্বপ্ন দর্শন হয় তাহাকে অধম নিদ্রা বলা যায় এই নিদ্রাই অধিকাংশ লোকের হইয়া থাকে। জাগ্রত অবস্থায় যে সকল শুভাশুভ বিষয় অনুভূত হয়, নিদ্রাকালে জীবাত্মা রজোগুণ বিশিষ্ট মন দ্বারা সেই সকল বিষয় গ্রহণ করেন। এইরূপ পূর্ব্বজন্মের অনুভূত বিষয়ও নিদ্রাকালে জীবাত্মা অনুভব করিয়া থাকেন। তাহারই নাম স্বপ্নদর্শন। নিদ্রার স্বপ্ন বা লঘু অবস্থাতেই স্বপ্ন হয়। কারণ ঐ নিদ্রায় বায়ুর সম্বন্ধ থাকায় মন কিছু কিছু কাজ করে, অথচ নিজের বশে থাকে না। কোন কোন নিদ্রা কেবল স্বপ্নময়। নিদ্রিত ব্যক্তি স্বপ্ন যোগে কখন রাজা, কখন বা কাঙ্গাল হয়। কখন আনন্দ সাগরে ভাসিতে থাকে, কখন কাঁদিয়া আকুল হয়। এক একজন স্বপ্ন যোগে এরূপ কাজ করিয়া বসে-- যাহা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। অনেক দিন পূর্ব্বে আমি এক ব্যক্তিকে গভীর রজনীতে নিদ্রাবস্থায় উঠিয়া ঘরের দরজা খুলিয়া ক্রোশাধিক পথ যাইতে শুনিয়াছিলাম। আর একটী লোক ঘুমাইতে ঘুমাইতে সমস্ত রাত্রি দ্বিতলস্থ এক অনাবৃত ছাদে ভ্রমণ করিয়াছিল। নিদ্রা একটী রহস্যময় ব্যাপার। নিদ্রার পূর্ব্বে সর্ব্বাঙ্গীন অবসন্নতা আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন এক অজ্ঞাত শক্তি যাহাকে আমরা দৈবী শক্তি বলি— মন ও শরীরের উপর কার্য্য করিতে থাকে। অক্ষিপল্লব ভার হয় ও মুদিয়া যায়। ক্রমে দৃষ্টি শক্তি, শ্রবণ শক্তি, ও স্পর্শ শক্তি, পর্য্যায়ক্রমে স্তিমিত হয়, শ্বাস প্রশ্বাস ও রক্ত সঞ্চালন ক্ষীণ হয় এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবসন্ন হইয়া পড়ে। বহির্মুখী গতি— অন্তর্মুখী হয়।

নিদ্রার মত আর একটী জিনিষ আছে, তাহাকে তন্দ্রা বলে, ইহাও অতি প্রসিদ্ধ। ইহার সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ লিখিবার প্রয়োজন নাই। নিদ্রায় ইন্দ্রিয় ও মন উভয়েরই মোহ হয় এবং ইন্দ্রিয়গণ রূপ রসাদি নিজ নিজ বিষয় গ্রহণে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া থাকে, কিন্তু তন্দ্রায় কেবল ইন্দ্রিয় মোহ, ইন্দ্রিয় সকলের অস্পষ্ট অনুভূতি থাকে এবং নিদ্রার্ত্ত ব্যক্তির ন্যায় চেষ্টা ও দেহের ভার বোধ হয়। নিদ্রাবেগ রোধ করিলে অর্থাৎ থিয়েটার যাত্রা অথবা বিবাহাদি কোন উৎসব বশতঃ নিদ্রাকে বল পূর্ব্বক বিতাড়িত করিলে, তন্দ্রা হয়, এরূপ স্থলে নিদ্রা ও সংবাহন (গাটেপান) হিতকর।

কোন কোন রোগের লক্ষণেও তন্দ্রা থাকে।

মহর্ষি চরক নিদ্রার ছয় প্রকার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

তমোভবা শ্লেষ্মা সমুদ্ভবা চ মনঃ শরীর শ্রম সম্ভবা চ
আগন্তুকা ব্যাধ্যানুর্ত্তিনী চ রাত্রি স্বভাব প্রভবা চ নিদ্রা॥
রাত্রি স্বভাব প্রভবা মতা যা তাং ভূতধাত্রীং প্রবদন্তি নিদ্রাং
তমোভবামাহুরঘস্যমূলং শেষং পুনর্ব্যাধিষু নির্দ্দিশন্তি॥

নিদ্রা তমোগুণ হইতে উৎপন্ন হয়, শ্লেষ্মা হইতে উৎপন্ন হয়, মন ও শরীরের শ্রান্তি হইতেও উৎপন্ন হয়, আগন্তুক কারণে অর্থাৎ অহিফেনাদি সেবনেও উৎপন্ন হয়, কোন কোন ব্যাধি হইতেও উৎপন্ন হয়, লোকে নিদ্রাকে ভূতধাত্রী কহিয়া থাকে, কেহ তমো-ভবা নিদ্রাকে পাপের মূল কহেন এবং অন্যান্য নিদ্রাকে ব্যাধির মধ্যে গণ্য করেন।

তমো গুণ জন্য নিদ্রা যথা—যে সকল আলস্যপরায়ণ ব্যক্তি দিবা রাত্রি উভয় কালেই নিদ্রা যান—তাঁদের অধিকাংশই তমো-গুণ প্রধান। তমো গুণ হইতে নিদ্রা কিরূপ হয় তাহা বুঝিতে হইলে আমাদের প্রকৃতি সম্ভূত সত্ব, রজ, তমো এই তিনটী গুণের বিষয়ে কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যদ্যপি অনেকেই এই গুণ তিনটীর বিষয় কিছু কিছু অবগত আছেন, তথাপি প্রসঙ্গক্রমে কিঞ্চিৎ বলা প্রয়োজন।

আমরা জাগতিক যাহা কিছু দেখি, প্রত্যেক বস্তুই কোন না কোন গুণ বিশিষ্ট, নির্গুণ কোন বস্তুই নাই। যেমন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ- এই পাঁচটী পঞ্চ মহাভূতের প্রধান গুণ। ইহাদিগকে বাদ দিলে আর কাহারও অস্তিত্ব থাকে না। শাস্ত্র বলেন- যাহাতে গুণ কর্ম্ম আশ্রয় করে—তাহাকেই দ্রব্য কহে। সেইরূপ সত্ব রজ ও তমো এই গুণ তিনটীকে বাদ দিলে জগতের যাহা মূল কারণ যাহার বিকারকেই আমরা জগৎ বলি- সেই প্রকৃতিকে আ'র পাওয়া যাইবে না প্রকৃতি না থাকিলে তার বিকৃতি জগতও থাকিতে পারে না। বিকৃতি কি তাহাও সংক্ষেপে বলিতেছি। সমতা প্রকৃতি ও বিষমতা বিকৃতি। সমতা যথা, সকল দ্রব্যেই ছয় প্রকার রস আছে, কিন্তু যদি এমন কোন দ্রব্য পাওয়া যায় যাহাতে ছয় প্রকার রসই সমভাবে বিদ্যমান, তাহা হইলে কোন রসেরই আস্বাদন সেই বস্তুতে পাওয়া যাইবে না। সকল রসই তাহাতে অব্যক্ত ভাবে বিদ্যমান সত্বেও কোন রস যে তাহাতে আছে ইহা কাহারও বোধগম্য হইবে না। সেইরূপ সত্ব, রজঃ তমো এই গুণ তিনটী যখন সমভাবে থাকে অর্থাৎ যখন প্রকাশও নয়, অপ্রকাশ নয়, আঁধার নয়, অলোকও নয়, জ্ঞানও নয়, অজ্ঞানও নয়, সুখও নয়, দুখও নয়, এই যে দ্বন্দাতীত অব্যক্ত অবস্থা--ইহাকেই প্রকৃতি এবং কোন গুণ ব্যক্ত হইলেই তাহাকে বিকৃতি বলে। কোনও একটী গুণের আধিক্য বা অল্পতা না হইলে তাহা প্রকাশিত হইতে পারে না। দুইজন মল্লযুদ্ধ করিতেছে—যদি উভয়েরই শক্তি সমান থাকে—তাহা হইলে উভয়েই একস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিবে, কেহই

হটিবে না। যদি এক জনের বল বেশী হয়, সে অপরকে হটাইবেই।

সত্ত্বঃ, রজঃ তমো এই তিনটী গুণ সমভাবে (অব্যক্ত অবস্থায়) না থাকিলে সৃষ্টি হইতে পারে না, এই জন্য দ্বন্দ্ব লইয়া জগৎ এবং দ্বন্দাতীত অবস্থাকে মুক্তি বলে। যাহা হউক গুড়ের মধুরতা যেমন গুড়, বিকার চিনি মিছরী প্রভৃতিতে সংক্রামিত হয়, সেইরূপ প্রকৃতির গুণ সকল প্রত্যেক জীবেই বিদ্যমান থাকিয়া স্বকীয় কার্য্য সুখ দুঃখ মোহাদি দ্বারা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ জীবাত্মাকে দেহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া থাকে। যেমন লক্ষণ দ্বারা রোগ নির্ণয় করিতে হয়, সেইরূপ কার্য্য দেখিয়া সত্ত্ব রজ, অথবা তমো গুণের স্থির করিয়া লইতে হয়, মানবদেহে প্রতিনিয়ত এই গুণত্রয়ের যুদ্ধ চলিতেছে, যখন যে গুণের প্রাধান্য হয়; তখন মানসিক অবস্থাও ঠিক সেই ভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। যখন সৎজ্ঞান জন্মে, সকল বস্তুতেই সেই বিরাট পুরুষের অস্তিত্ব অনুভব করে, সুখ দুঃখ মানাপমান তুল্য হইয়া যায়, স্বার্থ বুদ্ধি থাকে না, সত্য জ্ঞান হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, তখনই সত্ত্বগুণের প্রাধান্য হইয়া থাকে। যখন আসক্তি বৃদ্ধি হয়, কর্ম্ম স্পৃহা প্রবল হইয়া উঠে, নিত্যকে অনিত্য ও অনিত্যে নিত্য বোধ জন্মে; অহঙ্কার, দম্ভ, মান, কাম, ক্রোধ প্রভৃতির দ্বারা অভিভূত হইতে হয়, তখনই রজো গুণের প্রাধান্য বুঝিতে হইবে। যখন জ্ঞান আবৃত, কোন বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকে না, বিষাদ, নাস্তিকতা, দুষ্ট বুদ্ধিতা, অকর্ম্মকারিতা ও নিদ্রাধিক্য হইয়া থাকে, তখনই তমোগুণ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। জ্ঞানকে আবৃত করা তমোগুণের কার্য্য। যখন দেখিব জ্ঞানাচ্ছন্ন, কে যেন তাহার প্রকাশের পথকে রুদ্ধ করিয়াছে, তখনই বুঝিতে হইবে তমোগুণের আধিক্য বশতঃ সত্ত্ব ও রজঃগুণ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছে এবং তমোগুণ তাহার স্বাভাবিক শক্তি দ্বারা জ্ঞান রাজ্যে নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে।

হৃদয় চেতনার স্থান, তাহা তমোগুণ দ্বারা অভিভূত হইলে শরীরে নিদ্রা প্রবেশ করে অর্থাৎ চিত্তের অবসাদ জন্মাইয়া তাহার কার্য্যকরী শক্তি নষ্ট করিয়া দেয়। তখন ইন্দ্রিয়গণও সারথির অভাবে স্ব স্ব বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয়। বিশ্রাম উপভোগ নিদ্রা যে তমোগুণের কার্য্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণও তাহা বলিয়াছেন।

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাং
প্রমাদালস্য নিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥

এখন দেখা যাউক তমোগুণজাত নিদ্রাকে পাপের কারণ বলা হইয়াছে কেন? পাপ কাহাকে বলে—এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা দেখিতে পাই, যাহা আত্ম বিকাশের প্রতিকুল, যাহা ঈশ্বরের নিকট থেকে দূরে নিয়ে যায় তাহাকেই পাপ বলিয়া থাকে। এই আত্ম বিকাশের প্রতিকুল পদার্থ টীর নাম অজ্ঞান বা মোহ। এই মোহই ভগবানকে চিনতে দেয় না। এখন আমরা যদি অনুসন্ধান করি মোহ কোথা থেকে আসে—কে তাহার জন্ম দাতা—তাহা হইলে দেখিতে পাইব তমোগুণই তাহার কারণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহা হইলে তমো গুণই যখন মুলতঃ পাপের কারণ হইল, তখন তজ্জাত নিদ্রাও যে পাপের কারণ হইবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। তমোগুণ যেমন

নিদ্রাকে বর্দ্ধিত করে, নিদ্রাও তেমনই তমোগুণকে বর্দ্ধিত করে। যা'র তমোগুণ যত বেশী, সে জ্ঞানরূপী ভগবানের নিকট থেকে তত বেশী দূরে স'রে যায়। অতএব অধিক নিদ্রায় যেমন রোগ জন্মায় সেইরূপ পাপও জন্মাইয়া থাকে। ঔষধের যেমন রোগ-বিনাশক শক্তি থাকে, সেইরূপ তমোগুণেরও নিদ্রা জনক শক্তি আছে – ইহা একটু চেষ্টা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এখন শ্লেষ্মা জন্য নিদ্রার বিষয় আলোচনা করা যাউক। শ্লেষ্মা কাহারও অপরিচিত নহে। যা'কে সর্দ্দি লাগা বলে, তাহা ঐ শ্লেষ্মারই—কর্ম্ম। শ্লেষ্মাপ্রধান ব্যক্তির নিদ্রা অধিক হয়। শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হইলে যেমন নানাবিধ রোগের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ নিদ্রার আধিক্য জন্মাইয়া থাকে। শ্লেষ্মাবর্দ্ধক দ্রব্য প্রায়ই নিদ্রা বর্দ্ধক হয়। আহারের পর যে নিদ্রার ভাব আসে, শয্যা গ্রহণে প্রবৃত্তি জন্মায়, ঐ আহার জন্য তাৎকালিক শ্লেষ্মা বৃদ্ধিই তাহার কারণ। শ্লেষ্মা জন্য নিদ্রাকে জানিতে হইলে প্রথমে শ্লেষ্মার ধারণা করা প্রয়োজন, অতএব শ্লেষ্মা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। সকলেই জানেন যে, ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটী মহাভূতের সংমিশ্রণে আমাদের এই পঞ্চভূতাত্মক দেহ প্রস্তুত হইয়াছে। এই পঞ্চভূতই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া বায়ব্য, আগ্নেয়, ও সৌমরূপে জীবদেহে বর্ত্তমান থাকে এবং স্বস্ব কার্য্য দ্বারা দেহকে রক্ষা করে। যখন সৌম্য (জলীয়) ভাগের আধিক্য ঘটে অর্থাৎ যতটুকু জলীয়াংশ দেহ রক্ষার উপযোগী—তদপেক্ষা অধিক হইয়া পড়ে, তাহাকেই আমরা শ্লেষ্মা বৃদ্ধি বলিয়া থাকি। শ্লেষ্মার যে আশ্লেষণ শক্তি আছে তাহা দ্বারা সে চিত্তকে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। গুরুতা প্রযুক্ত শারীরিক যন্ত্রগুলি গুরুভার বহন করিয়া কার্য্য করায় অবশ হইয়া পড়ে এবং জলীয় ভাগের আধিক্য বশতঃ স্রোত সকল রুদ্ধ হওয়ায় মন তাহার পথ দিয়া ইন্দ্রিয়গণের নিকট পৌছিতে পারে না, বিষয় গ্রহণও হয় না। জড়ত্ব হেতু দেহেরও জড়তা বৃদ্ধি করিয়া তমো গুণের কার্য্য প্রকাশ করে ও নিদ্রা জন্মায়। অথবা ক্ষিতি ও জল নামক যে দুইটী ভূতের আধিক্যে শ্লেষ্মার উৎপত্তি, সেই দুই টীই তমোগুণ বহুল বলিয়া চিত্তের অবসাদক হয়, অতএব মনীষিগণ নিদ্রাকে কফের কর্ম্ম বলিয়াছেন যথা—

"চিরকর্ত্তৃত্বং শোথো নিদ্রাধিক্যংরসৌ
পটুস্বাদু
বর্ণঃ শ্বেতোঽলসতা কর্ম্মাণি কফস্য
জানীয়াৎ

বায়ু নিদ্রানাশক ও কফ নিদ্রাজনক ইহা যদি আমরা শরীরের দিকে একটু দৃষ্টি রাখি—তাহা হইলেই বুঝিতে পারিব। নিদ্রার যে ছয়টী কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তন্মধ্যে তমো ও শ্লেষ্মাই প্রধান বা ক্ষেত্র (উৎপত্তিস্থান)। যেমন শস্যের ক্ষেত্র ভূমি, ভূমি ভিন্ন শস্য জন্মিতে পারে না। এই প্রকার প্রত্যেক রোগেরই এক একটী ক্ষেত্র আছে। যেমন পিত্তকে জ্বরের ক্ষেত্র বলে, যেহেতু পিত্ত ভিন্ন জ্বর হইতে পারে না। জ্বর মাত্রেই সন্তাপ আছে, সেই সন্তাপ পিত্ত ভিন্ন থাকে না। সেইরূপ তমো ও শ্লেষ্মাই নিদ্রা জন্মায়, এই দুইটী ভিন্ন জন্মিতে পারে না. নিদ্রায় যে মোহ থাকে,

তাহা তমোগুণ না হইলে হইতে পারে না এবং স্নিগ্ধত্বাদি গুণও শ্লেষ্মা ভিন্ন হয় না। অতএব তমো ও শ্লেষ্মাই নিদ্রার ক্ষেত্র বুঝিতে হইবে, অন্যান্য গুলি সহায় হয় মাত্র। তন্মধ্যে যাহার প্রাধান্য থাকে—যে প্রধান ও প্রথম কারণরূপে প্রতীয়মান হয়—আমরা তাহাকেই নিদ্রার কারণ বলি। তমো জন্য নিদ্রাতে শ্লেষ্মা এবং শ্লেষ্মা জন্য নিদ্রাতেও তমোগুণ থাকে। কিন্তু প্রাধান্য অনুসারে নাম নির্দ্দেশ হয়।

তমোগুণের কার্য্য যে সংজ্ঞানাশ—তাহা মূর্চ্ছা, ভ্রম, তন্দ্রা ও নিদ্রা এই সকলের মধ্যেই থাকে। কিন্তু আমরা যে উহাদের পার্থক্য অনুভব করি—তাহার কারণ বাত-পিত্ত শ্লেষ্মা। উহারাই নিজ নিজ পৃথক পৃথক কার্য্য দ্বারা পার্থক্য জন্মাইয়া থাকে। এই জন্য শাস্ত্রকার উহাদের ভেদ নির্ণয় করিতে গিয়া বলিয়াছেন।

মূর্চ্ছা পিত্ত তমো প্রায়া রজঃ পিত্তানিলাদ্ ভ্রমঃ
তমো বাত কফাৎ তন্দ্রা নিদ্রা শ্লেষ্মা তমো ভবা॥

মন ও শরীরের শ্রম হইতে যে নিদ্রা হয় তাহা যেন ভগবানের আশীর্ব্বাদ স্বরূপ। তিনি যেন তাঁ'র অনুচরবর্গকে পরিশ্রমে কাতর দেখে দয়াপরবশ হ'য়ে ছুটী দিয়েছেন। মনও ইন্দ্রিয়গণ ক্লান্ত হ'য়ে যখনই ছুটীর প্রার্থনা জানায়, আত্মরূপী ভগবান্ সুচতুর প্রভুর মত তৎক্ষণাৎ তা'দের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। নেত্র মিলনের সঙ্গে সঙ্গেই যেন জ্ঞানরূপী হৃৎপদ্মও বুঁজিয়ে যায়। তমোগুণ তা'র সমস্ত শক্তি দিয়ে সত্ব ও রজঃ গুণকে অভিভূত ক'রে ফেলে।

ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ আলয়ে বিশ্রাম সুখ উপভোগ ক'রে নববলে বলীয়ান হয়। কে যেন অজ্ঞাতসারে কোথা থেকে নূতনশক্তি নিয়ে এসে তাঁ'দের শরীরে প্রবেশ করিয়ে চ'লে যায়। জাগরণের সঙ্গেসঙ্গেই তা'রা নূতন স্ফূর্ত্তি—নূতন উদ্যম নিয়ে আবার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। এইজন্যই শ্রান্ত ব্যক্তির দিবানিদ্রা অন্যায় নহে।

আকস্মিক কারণে যে সকল নিদ্রা উপস্থিত হয় তাহাদিগকে আগন্তুকী নিদ্রা বলে। যেমন অহিফেনাদি সেবন জন্য নিদ্রা। অহিফেনের এমন একটী আকর্ষণ আছে, যাহা দ্বারা সে শুধু মনকেই আকর্ষণ করে না, শারীরিক যাবতীয় যন্ত্রকেই সঙ্কুচিত করে এবং সেই আকর্ষণের ফলে হৃৎপদ্মকে বলপূর্ব্বক মুদ্রিত করে, তখন ইন্দ্রিয়গণ কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয় না। কে যেন ভিতর হ'তে চক্ষুর পাতা দু'টাকে টানিয়া নামিয়ে দেয়, তখন আমাদিগকে বাধ্য হয়ে নিদ্রার আশ্রয় নিতে হয়। ডাক্তার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং বলেন, গলার উভয় পার্শ্বস্থ কেরোটীড্ ধমনী অঙ্গুলী চাপিয়া ধরিলে ও নিদ্রা আইসে। এতদ্বারা মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র শিরা সকলের সাময়িক সংকোচন হইয়া অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ইহাও আমাদের আগন্তুকের মধ্যে পরিগণিত। কোন কোন ব্যাধিতে নিদ্রা ও অনিদ্রা উভয়ই উপদ্রবরূপে উপস্থিত হয়। যেমন শ্লৈষ্মিক জ্বরে অতিশয় নিদ্রা ও বাতিক জ্বরে অনিদ্রা হয়, এসকল স্থলে কেবল শ্লেষ্মাকেই নিদ্রার কারণ বলিলে চলিবে না। কারণ তাহা হইলে শ্লেষ্মা জন্য যত প্রকার রোগ আছে সকল রোগেই নিদ্রা হইতে পারিত তাহা হয় না। অতএব বুঝিতে হইবে কোন কোন ব্যাধিরও এমন একটী শক্তি আছে

যাহা নিদ্রা জন্মাইবার পক্ষে সহায়তা করে। এই নিদ্রা মূল রোগের উপশমের সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া যায়। যে সকল স্থানে রোগ অপেক্ষা উপদ্রবের প্রাবল্য দৃষ্ট হয় সে স্থানে উপদ্রবেরও পৃথক চিকিৎসা আবশ্যক,অতএব যদি নিদ্রা বা অনিদ্রার এমন অনিষ্টজনক আশঙ্কা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ইহাদের পৃথক চিকিৎসা করিতে হইবে। যে নিদ্রা রাত্রি স্বভাববশতঃ প্রতিদিন হইয়া থাকে উহাকেই ঋষিগণ জীবজননী বলিয়াছেন। নৈশ অন্ধকার ও নিস্তব্ধতা স্নায়ু মণ্ডলীর উত্তেজনা দূর করে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাকর্ষনের বেশ সুবিধা করিয়া দেয়। এ নিদ্রা অন্যান্য নিদ্রার ন্যায় কারণ হইতে জাত নহে। সকলকেই সমভাবে ইহা আশ্রয় দিয়া থাকে।

পেচক প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণী আছে তাহারা রাত্রিতে জাগ্রত থাকে ও দিবাভাগে নিদ্রা যায়। সাপ, ব্যাঙ, প্রভৃতি কেহ কেহ সমস্ত শীত কালটা নিদ্রায় কাটায়। আবার রোহিত মৎস্য একেবারেই নিদ্রা যায় না। আমরা যত প্রাণী দেখিতে পাই অধিকাংশই রাত্রিতে নিদ্রা যায়। নিদ্রার অনেক প্রকার আশ্চর্য্য অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ শয়নের পর নিমেষ মধ্যেই নিদ্রায় মগ্ন হয়। আবার কাহারও বা অনেক পরে নিদ্রা আইসে। কোন কোন ব্যক্তির নিদ্রাবস্থায় ভয়ানক নাসিকা গর্জ্জিতে থাকে। ঐ গর্জ্জনে বাড়ীর অন্যান্য লোকের ঘুমের ব্যাঘাত জন্মায়। 'হা' করিয়া ঘুমাইলে শ্বাস গ্রহণ কালে তালুতে বায়ুর আঘাত লাগিয়া ঐ শব্দ উৎপন্ন হয়। গলার মধ্যে আল্‌জিভ্ বড় থাকিলে অর্থবা শ্লেষ্মায় নাক বন্ধ থাকিলেও ঐরূপ শব্দ হইতে পারে। কেহ কেহ নিদ্রাবস্থায় ভয় পায়, মনে করে কে যেন তাহার গলা চাপিয়া ধরিতেছে। সে নিশ্বাস ফেলিতে পারে না, শ্বাস কষ্টে অস্থির হইয়া উঠে, হস্ত পদাদি অবশ হয়, নাড়িবার শক্তি থাকে না। এই কর্ম্মময় জগতে সর্ব্বদা কাজ করিবার জন্যই বিধাতা জীব সৃষ্টি করিয়াছেন ; এবং কর্ম্মের উপযোগী যাহা কিছু দরকার সমস্তই দিয়াছেন। রাত্রিটা যেন কেরাণীদের রবিবার, অফিস বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে ইলেক্‌ট্রিকের কারেণ্ট বন্ধ হয়। আলো আর জলে না। বিনা প্রয়োজনে এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে মহাজন রাজী নয় ; অথবা কেরাণীদের সঙ্গে সঙ্গে তা'রাও ছুটী পায়। যদি কেহ দিনের বেলায় (অফিস্ টাইমে) কর্ম্মক্ষেত্রে নিযুক্ত না থেকে ; তাঁর আদিষ্ট কর্ম্মে অবহেলা প্রদর্শন করতঃ নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতে চায়, বিশ্বপ্রভু তাঁকে ভবনদী উত্তীর্ণ হ'বার সার্টিফিটে ত দেনই না অধিকন্তু আইন অমান্য জন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ যথোচিত শাস্তি দিয়ে যাহাতে পুনর্ব্বার এরূপ পাপ কর্ম্ম না করে তাহার জ্ঞান জন্মাইয়া দিবার চেষ্টা করেন। এই জন্যই আমাদের উপনয়নে 'মা দিবা স্বাপ্সী" বলিয়া দিবা নিদ্রার নিষেধ করা হইয়াছে। এস্থলে অনেকের এরূপ প্রশ্ন আসিতে পারে যে, যদি দিবা নিদ্রা পাপই হয় তাহা হইলে শূদ্রের পক্ষে এরূপ নিষেধ নাই কেন! সকল প্রকারই তো সকলের পক্ষে সমান যে মদ্যপান ব্রাহ্মণের মহাপাপের মধ্যে পরিগণিত, তাহা শূদ্রের পক্ষেও পাপ নহে কি! বৃদ্ধের যাহা পাপ

বালকের তাহাতে পাপ নাই। অকাল মৃত্যুর যতগুলি কারণ আছে তন্মধ্যে দিবানিদ্রা অন্যতম। দিবানিদ্রা অতি কদর্য্য কর্ম্ম; অসময়ে বা অতিশয় নিদ্রা জন্য কাস, খাস, প্রতিশ্যায় মস্তকের ভার, অঙ্গমর্দ্দ, অরুচি, জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, হলীমক, শিরঃশূল, স্তৈমিত্য, গাত্রভার, হৃদয়ের উৎক্লেশ, শোথ, হৃল্লাস, পীনস, অর্দ্ধাবভেদক, কোঠপিড়কা, কণ্ডূ, তন্দ্রা, কর্ণরোগ, স্মৃতিনাশ, বুদ্ধিনাশ, স্রোতোরোধ ইন্দ্রিয়গণের সামর্থ্যহীনতা প্রভৃতি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

রাত্রিকালে জাগরণ করিলেও বায়ু, পিত্ত জন্য ঐ সকল উপদ্রব জন্মাইতে পারে। অতএব রাত্রি জাগরণ ও দিবানিদ্রা—উভয়ই বর্জ্জন করিতে শাস্ত্রের উপদেশ আছে। প্রায় দেখা যায় নিষ্কর্ম্মা লোকেরা দিবসের অধিকাংশ সময় নিদ্রায় ব্যয় করিয়া থাকেন। আবার পক্ষান্তরে কর্ম্মবীরেরা কাযের নেশায় পড়িয়া সময়ে সময়ের নিদ্রার নিয়মিত কালকেও প্রায় নির্ব্বাসিত করিবার যোগাড় করিয়া তোলেন। এতদুভয়ই স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতিকূল।

রাত্রি জাগরণে শরীরের রুক্ষতা বৃদ্ধি হয়। দিবানিদ্রায় স্নিগ্ধতা বৃদ্ধি হইয়া শ্লেষ্মা জন্য রোগ সকল জন্মায়।

গ্রীষ্মকালে লোকের শরীর উত্তরায়ন কাল-ধর্ম্মে রুক্ষ হয়। তখন দেহে বায়ু সঞ্চিত হইতে থাকে। আদানকালের পরিপূর্ণতা হেতু সূর্য্যের তেজ বৃদ্ধি হয় এবং দিনমান বৃদ্ধি হওয়ায় সূর্য্য আমাদের দেহ হইতে অন্যান্য ঋতু অপেক্ষা এই ঋতুতে অধিক রস গ্রহণ করেন। রাত্রিমান অল্প হওয়ায় এবং গ্রীষ্ম জন্য রাত্রিতেও উপযুক্ত নিদ্রা হয় না। অতএব কেবল গ্রীষ্ম ঋতুতেই দিবা নিদ্রা প্রশস্ত। ঐ ঋতুতে সূর্য্য-সন্তাপে অধিক ক্ষয় হওয়ায় শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত না হইয়া ক্ষয়পূরণের সহায়ক হয়। আমাদের শরীরের জলীয় ভাগ শারীরিক উষ্মা দ্বারা উত্তপ্ত হইয়া সর্ব্বদা বাষ্পাকারে উত্থিত হইতেছে। তাহা এত সূক্ষ্ম যে, কেবল শীত ঋতু ভিন্ন অনুভব করিতে পারা যায় না। শীতকালে বাহিরের শৈত্যপ্রভাবে ঐ সূক্ষ্ম বাষ্প গাঢ় হইয়া ধুমাকারে উত্থিত হওয়ায় দেখিতে পাওয়া যায়।

সমস্ত দিনে যাহা ক্ষয় হয় রাত্রিতে নিদ্রা দ্বারা তাহার পূরণ হইয়া সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। সকল বিষয়েরই একটী নিয়মিত মাত্রা আছে, তাহার অধিক বা অল্প হইলেও দুঃখের কারণ হয়। আমরা যদি রাত্রিতে জাগরণ করি, তাহা হইলে নিদ্রার যে ক্ষয় পূরণ হইত তাহা হইতে পারে না। তাহার ফলে বায়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আবার যদি দিবসে নিদ্রা যাই, তাহা হইলেও জাগরণে যে ক্ষয় হইত তাহা না হইয়া শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি উভয়ই দোষজনক জানিয়া পরিমিত রূপে নিদ্রা যাইবেন। নিদ্রা পরিমিত হইলে দেহ নীরোগ ও বল বর্ণ যুক্ত হয়—স্থূল বা কৃশ না হইয়া মধ্য ভাবে থাকে। একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে দৈনিক ৭।৮ ঘণ্টা নিদ্রার প্রয়োজন। রাত্রি ৯টা হইতে ৪টা অথবা ৫টা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাওয়াই বিধি। বৃদ্ধদিগের পক্ষে পূর্ণ বয়স্ক অপেক্ষা নিদ্রার পরিমাণ আরও কিছু বৃদ্ধি করিতে হইবে, কারণ বার্দ্ধক্যে

শারীরিক ক্ষয় অধিক হইতে থাকে। শিশুদের যথেষ্ট ঘুমাইতে দেওয়ার বিধি আছে। ৪ হইতে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত ১০ ঘণ্টা ঘুমের মাত্রা করা মন্দ নহে।

অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করা বিধেয়। এই সময়ের বায়ু পবিত্র ও নির্ম্মল থাকায় দেহ রক্ষার সমধিক উপযোগী হয়। অধিক বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইয়া উঠিলে শরীরে জড়তা বৃদ্ধি হওয়ায় তেমন স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় না।

তাহা ছাড়া চক্ষু দুটী অকালে শক্তিহীন হইয়া পড়ে। সমস্ত রাত্রি যে চক্ষু মুদ্রিত অবস্থায় ছিল, তাহাকে হঠাৎ যদি সূর্য্যের প্রখর কিরণের মধ্যে খোলা হয়, তাহাতে স্নায়ু মণ্ডলীর অস্বাভাবিক উত্তেজনা বশতঃ দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হইয়া থাকে।

দিবানিদ্রা দোষাবহ হইলেও আবার এমন কতকগুলি স্থান আছে যেখানে দিবা নিদ্রাতে অপকার না হইয়া থাকে। কারণ সে স্থলে শ্লেষ্মার বৃদ্ধিরই প্রয়োজন।

যে যে অবস্থায় দিবা নিদ্রা প্রশস্ত, মহামতি চরক একটী শ্লোকে তাহার উপদেশ দিয়াছেন। শ্লোকটীর অর্থ এই,—

"যাঁহারা গীত, অধ্যয়ন, মদ্যপান, স্ত্রীসংসর্গ, পরিশ্রম, ভারবহন ও পথ ভ্রমণ দ্বারা ক্লান্ত হইয়াছেন; যাঁহারা অজীর্ণ রোগী, ক্ষত রোগী বা ক্ষীণ রোগী—যাঁহারা বৃদ্ধ বা বালক বা দুর্ব্বল, যাহারা পতিত, আহত বা উন্মত্ত, যাঁহারা তৃষ্ণা, অতিসার ও শূলরোগে আক্রান্ত, যাঁহারা শ্বাসরোগ বা হিক্কাগ্রস্ত বা কৃশ; যাঁহারা যানারোহণ ও রাত্রি জাগরণ দ্বারা শ্রান্ত, যাঁহারা ক্রোধ, শোক ও ভয়ে ক্লান্ত এবং যাঁহারা দিবা নিদ্রা অভ্যস্ত, তাঁহারা সকলেই সর্ব্বকালে দিবা নিদ্রা সেবন করিবেন।

তৃষ্ণা, শূল, হিক্কা, অজীর্ণ ও অতিসার রোগে দিবানিদ্রায় বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

বায়ুপ্রবলতা, পিত্তপ্রবলতা, মনস্তাপ, ক্ষয়, ভয়, লোভ, উদ্বেগ, মানসিক দুশ্চিন্তা এই সকলই অনিদ্রার প্রধান কারণ। নিদ্রাহীন ব্যক্তি এক বিষম দুর্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করে। যখনই দেখিবেন রাত্রিতে উপযুক্ত নিদ্রা হইতেছে না, তখনই তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করা উচিত। নিদ্রা নাশ হইলেই প্রত্যনীক ক্রিয়া অর্থাৎ যে সকল কারণে নিদ্রা নষ্ট হয় তাহার বিপরীত ক্রিয়া করিতে হয়। অভ্যঙ্গ, উৎসাদন, স্নান, গ্রাম্য ও ঔদক মাংস রস, শাল্যন্ন, দধি ও দুগ্ধাদি স্নেহ সেবনের ব্যবস্থা করা উচিত। নিম্নে কয়েকটি মুষ্টিযোগের কথা বলা যাইতেছে,—

আমলকী চূর্ণ ঘৃতে ভাজিয়া ১ তোলা মাত্রায় মধুর সহিত রাত্রিতে সেবন করিলে সুনিদ্রা হইয়া থাকে। মন্দনিদ্র ব্যক্তি পিপুলের মূল চূর্ণ গুড়ের সহিত আলোড়িত করিয়া লেহন করিবেন, দুগ্ধ, মাংসরস, দধি, অভ্যঙ্গ তৈল মর্দ্দন, স্নান, মস্তক কর্ণ ও চক্ষুর তৃপ্তি সাধন এই গুলি অভ্যাস করিবেন। ইক্ষুবিকার, পুঁইশাক, মাষকলাই, মৎস্যরস, দুগ্ধ, গোধূম, তিল ও মৎস্য এই সকল দ্রব্য নিদ্রাজনক। যে সকল ব্যক্তি অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত মানসিক শ্রম করেন, তাঁহারা শয়ন করিবার পূর্ব্বে অল্পকাল মুক্তবায়ুতে পরিভ্রমণ করিলে সহজেই অনিদ্রার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন। আমরা দেখিয়াছি, রাত্রিতে কেরোসিন অনুলেপন করিলে বায়ু বৃদ্ধি

হইয়া আর নিদ্রা আসিতে চায় না, সেরূপ স্থলে মস্তক, মুখ ও চক্ষু শীতল জল দ্বারা ধৌত করিয়া একটু ভ্রমণের পর শয়ন করিলেই নিদ্রা আসে। কাশ্মীর দেশে একটী প্রথা আছে যে, তথাকার জননীগণ রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে শীতল জলে সন্তানের মস্তক ধৌত করিয়া দেন। ইহাও সুনিদ্রা আনয়নের প্রকৃষ্ট উপায়।

ক্ষুধা।

[শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভাগবতভূষণ*]

আমরা সকলেই ক্ষুধার জন্য লালায়িত। কাহারও ক্ষুধা না থাকিলে বা তাহার হ্রাস হইলে তিনি বিপদ মনে করেন, কত ডাক্তার-কবিরাজের নিকট যান, কত ঔষধ খান, তাহাতেও হয়ত তৃপ্ত হন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ক্ষুধাই যে আমাদের সংনাশ সাধক, প্রাণহারক—তাহা আমরা বুঝিনা।

আমাদের শরীর নিত্য ক্ষয় হইতেছে। আমরা প্রত্যহ যাহা কিছু করি—নড়াচড়া, এমন কি শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া—তাহাতে তিলে তিলে আমাদের শরীর ধ্বংস-মুখে অগ্রসর হয়। কিছু কর্ম্ম না করিয়া চুপ করিয়া নীরব নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া থাকিলেও শ্বাস প্রশ্বাসের হাত হইতে আমরা অব্যাহতি পাই না, সুতরাং তাহাতেও আমরা মৃত্যুপথে ধাবিত হই। অনেক রোগী রোগমুক্ত হইয়াও কেবল নিশ্বাস লওয়ার শক্তির অভাবে দেহত্যাগ করে। এমনই ভাবে,যে কোন কর্ম্মই আমাদের 'প্রাণ ক্ষয়'।

যোগ-সাধন করিতে হইলে সকল কর্ম্ম ত্যাগ করাই সেই জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। তাহা না করিলে মৃত্যুঞ্জয় হওয়া যায় না। যোগে এই জন্য শ্বাসরোধ পর্য্যন্ত উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রাণায়াম-সাধনায় সে কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। তাহাই মহাযোগীর যোগসাধনায় তাঁহার তৎকালীন অবস্থা "নিবাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্" বলিয়া "কুমার সম্ভবে" কবি লিখিয়াছেন।

যাহার যতটা ক্ষুধার আধিক্য, তাহার সেই পরিমাণে শরীরের ক্ষয় হইয়া থাকে। যাঁহাদের সুস্থ শরীরে অনেক খাইলে ক্ষুন্নিবৃত্তি

---

* প্রস্তাব-লেখক প্রথিতনামা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র এবং অমর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। ইনি স্বয়ং একজন নানা শাস্ত্রদর্শী সুপণ্ডিত ও ভগবদ্ভক্ত, তদ্ভিন্ন সুমধুর উচ্ছ্বাস ময় কীর্ত্তন-গায়ক। ইঁহার শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে ইনি "প্রভু জ্যোতিশ্চন্দ্র" নামে খ্যাত। সংবাদ পত্রাদিতে ইহাঁর সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে আলোচনা হইয়া থাকে। ইহাঁকে প্রবন্ধ-লেখক স্বরূপ পাইয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আঃ সং

হয়, প্রায় দেখা যায়, তাঁহারা অধিক দিন বাঁচেন না। রোগীর মধ্যে বহুমূত্র রোগীও ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। থার্ম্মিটারে যেমন জ্বর পরিমিত হয়, ক্ষুধার ন্যূনাধিক্যে সেইরূপ দেহের ক্ষয় পরিমিত হইয়া থাকে। সেই জন্য সকলেরই অল্পাশী বা মাত্রাশী হওয়ার কথা আয়ুর্ব্বেদ তারস্বরে বলিয়াছেন। যোগাভ্যাসের প্রথম অবস্থায় ঐ রূপ অল্পাহার করিতে হয়, ফল পাতা খাইয়া দিনপাত করিতে হয়। তখন যোগীর সবিকল্প সমাধির অবস্থা থাকে, তাহার ব্যুত্থান আছে। তাহাই কিছু আহারের আবশ্যক হয়। তাহার পর আর আহারের আবশ্যকই হয় না। তখন নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থায় যোগী ক্ষুৎপিপাসাদি বিবর্জ্জিত হইয়া মৃত্যুঞ্জয়ত্ব বা শিবত্ব লাভ করেন। যতদিন তাঁহাকে ক্ষুধার অধীন থাকিতে হয়, অর্থাৎ যতদিন তিনি কিছু না খাইয়া পারেন না, ততদিন তাঁহার সবিকল্প সমাধি থাকে, ততদিন তিনি অমর বা শিব নহেন। বোধ হয়, এই জন্যই শিবের অন্নভোগ হয় না। শিলারূপী নারায়ণকেও অন্ন ভোগ দিতে হয়। কিন্তু লিঙ্গরূপী শিবের সে 'ছেঁড়া-ল্যাঠা' নাই। কারণ শিব যোগীশ্বর—মহাযোগী। তবে তাঁহাকে নৈবেদ্যাদি নিবেদন করিয়া দেওয়া হয় বটে, তাঁহার কারণ, ভক্তের কাতর আবাহনে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হয়। কাজেই তখন যোগীর সবিকল্প সমাধির ব্যুত্থানের ন্যায় তাঁহাকে কিছু খাইতে হয়; কিন্তু তখন যাহা তিনি খান, তাহা ফল পাতা বা তাহারই মত কিছু;—অন্নের ন্যায় গুরুভোজ্য নহে। ভক্ত বা পূজক যে তাঁহার সমাধিভঙ্গ করে, তৎ-সম্বন্ধে আমাদের দেশে একটি সনাতন পদ্ধতি প্রচলিত আছে। শিব-ব্রত বা গাজনের সময় 'সন্ন্যাসী'রা পূজা করিবার পূর্ব্বে "প্রভু যোগ-নিদ্রা কর ভঙ্গ, সেবকের দেখ রঙ্গ, পরিহার তোমার চরণে", ইত্যাদি স্তব করিয়া তাঁহার সমাধি ভঙ্গ করে।

আমরা যাহা খাই, তাহার সারাংশ আমাদের শরীরস্থ সপ্তধাতুর পোষণ করিয়া অসার অংশ মলস্বরূপ নির্গত হয়। কিন্তু যাঁহাদের অগ্নির বিলক্ষণ তেজ আছে, তাঁহাদের মলসঞ্চয় অল্পই হইয়া থাকে; এই জন্য তাঁহাদের শৌচ-ক্রিয়ার নিত্য প্রয়োজন হয় না। আমরা এমনও লোক দেখিয়াছি, যাঁহারা সপ্তাহে দুই বারের অধিক মলত্যাগ করেন না, অথচ তাঁহাদিগের শরীরে কোন ব্যাধির লক্ষণ দেখা যায় না, পরন্তু তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট ও আনন্দময় দেখা যায়। যোগীরাও এই কারণে নিত্য মলত্যাগ করেন না। একটা প্রবাদ আছে:—একবার যোগী, দুইবার ভোগী, তিনবার রোগী।

মিতাচারী ও অল্পভোগী হইলে এবং পারমার্থিক চিন্তায় ব্যাপৃত থাকিলে শরীর ও মন সুস্থ থাকে। সে অবস্থায় মলে দুর্গন্ধের পরিবর্ত্তে সদ্‌গন্ধ হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের ৩২ শ্লোকে ভগবান ঋষভদেবের যোগসাধন বিষয়ে ঐ কথা লিখিত হইয়াছে, যথা;—

তস্য হ যঃ পুরীষসুরভিসৌগন্ধ্য বায়ুস্তং দেশং দশযোজনং সমন্তাৎ সুরভী চকার।

ইহার মোট অর্থ এই যে, ঋষভদেবের বিষ্ঠার সদ্‌গন্ধে দশযোজন স্থান পর্য্যন্ত আমোদিত হইয়াছিল।

একজন চিকিৎসাতত্ত্ববিদ্ ইংরাজও এই

ভাবের কথা বলিয়াছেন। ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে "Statesman" সংবাদপত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, সুস্থব্যক্তির মলে দুর্গন্ধের পরিবর্ত্তে সদ্‌গন্ধ থাকে। সে কাগজখানি এখন আমার সম্মুখে নাই ও তাহার সন তারিখও আমার মনে নাই, কিন্তু তিনি যে উক্ত মল সম্বন্ধে 'of good odour' (সদ্‌গন্ধ-বিশিষ্ট) লিখিয়াছিলেন, ইহা আমার বেশ মনে আছে। কাগজখানি আমি সযত্নে রাখিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু এখন তাহা খুঁজিয়া পাইলাম না। তাহাই তাহা হইতে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

এখন এ সকল কথা যাক। ক্ষুধার বিষয় বলিতে যাইয়া আমরা অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। আমরা বলিয়াছি যে, ক্ষুধাই আমাদের দেহ নষ্ট করে। শাস্ত্র বলিয়াছেন যে. ত্রিগুণের মধ্যে রজোগুণে সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে পালন বা স্থিতি এবং তমোগুণে নাশ হয়। ক্ষুধা রজোগুণের সহায়ক ; কারণ, উহাতে আহারের দ্বারা দেহের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধাতু শুক্রের পুষ্টিসাধন হয় ; সুতরাং উহা জীবসৃষ্টির হেতুরূপে কার্য্য করে। পক্ষান্তরে, ইহাতে স্থিতি বা পালন কার্য্যও হয়। কারণ, ক্ষুধা না হইলে আমরা আহার করিতে পারি না, এবং আহার না করিলে আমরা জীবিত থাকিতে পারি না। এই রূপে ক্ষুধা—সৃষ্টি ও স্থিতির সহায়ক হইয়াও ভিতরে ভিতরে প্রলয়ের বা নাশের কার্য্য করিয়া থাকে। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ক্ষুধা দেহ-ক্ষয়ের একরূপ পরিমাপক-যন্ত্র মাত্র।

এখন একদিকে আমরা দেখিতেছি যে, তমোগুণাত্মক ক্ষুধাই সত্ত্ব গুণের ও রজোগুণের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। ইহা হইতে আমরা পুরাণের একটি গভীর তথ্য বুঝিতে পারি। শৈব-পুরাণ মাত্রেই, রজোগুণাত্মক ব্রহ্মা ও সত্ত্বগুণাত্মক বিষ্ণু এতদুভয়ের উপর তমোগুণাত্মক শিবের বা রুদ্রের প্রভুতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহা কিরূপে সিদ্ধ হয়, তাহা এখন আমাদিগের বুঝিতে বাকী রহিল না, অন্ততঃ আমরা কতকটাও বুঝিলাম। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এ তিনের (বা সত্ত্বরজস্তমগুণত্রয়ের) প্রত্যেকের অপর দুইটির উপরে বিষয়-বিশেষে প্রভুতা আছে বা হইয়া থাকে, এবং ইহারা আপনাদের মধ্যে কাহাকেও ক্ষণকালের জন্যও পরিত্যাগ করেন না। তাহাই মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলিয়াছেন :—

ক্ষণং বিয়োগো ন হ্যেষাং ন ত্যজন্তি পরস্পরম্।

দেবী ভগবতী মহামায়া ত্রিগুণাত্মিকা বলিয়া পুরাণে কথিতা। রজোগুণের কার্য্যে—তিনি ব্রহ্মার শক্তি বা ব্রাহ্মী, সত্ত্বগুণের কার্য্যে—তিনি বৈষ্ণবী বা বিষ্ণুর শক্তি এবং তমোগুণের কার্য্যে তিনি শৈবী, রুদ্রাণী বা শিবশক্তি। মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত চণ্ডীতে তাঁহাকে ত্রিগুণাত্মিকা ভাবে অনেক স্থলে স্তব করা হইয়াছে। তন্মধ্যে "নারায়ণী স্তোত্র" বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহাতে তাঁহার রজোগুণাত্মক ও সত্ত্বগুণাত্মক ভাবের স্তুতির সহিত তমোগুণাত্মক বা নাশকর ভাবের স্তুতিকালে বিশেষ মতে উল্লিখিত হইয়াছে—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

আবার তাঁহার তমোগুণ বা প্রলয়ঙ্করী শক্তি সম্বন্ধে "আদ্যা" স্তোত্রে বলা হইয়াছে :—

ক্ষুধা ত্বং সর্ব্বভূতানাম্ বেলা ত্বং সাগরস্য চ।

সাগরের বেলাও প্রলয়ের বা বিনাশের গম্ভীর চিত্র। এই বেলায় কত না অজস্র নর-নারী-দেহ বিলুণ্ঠিত! এই বেলা কত না বুভুক্ষু শবভুক্ পশু পক্ষীদিগের কঠোর চীৎকারে নিরন্তর মুখরিত। এই বেলায় কত না পোত চূর্ণীকৃত—অন্ধকারে সে দৃশ্য আরও কত ভয়ানক! তাহাই আমেরিকান কবি Edgar Allan Pœ তাঁহার বিখ্যাত "Raven" নামক কবিতায় সাগর-বেলার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, Night's Plutonian shore অর্থাৎ "কৃতান্তের তামসী-বেলা"।

পুনশ্চ "প্রাধানিক রহস্য" নামক তন্ত্র—তামসী অর্থাৎ বিনাশকারিণী শক্তি মহাকালীর নামকরণ কালে "ক্ষুধা" তাঁহার অন্যতম নাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা:—

মহামায়া মহাকালী মহামারী ক্ষুধাতৃষা।
নিদ্রা তৃষ্ণা চৈকবীরা কালরাত্রির্দুরত্যয়া॥

এখন বুঝ ক্ষুধা কি জিনিস!!!

পল্লীমাতার অরণ্যে রোদন।

[শ্রীক্ষীরোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ]

পল্লী উদ্ধারে প্রত্যেক নগরবাসী মনোনিবেশ করুন। সহরে ভদ্রমহোদয়গণ সুসজ্জিত বৈঠকে বসিয়া বুদ্ধিবলে অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন বটে, কিন্তু দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার (লঘু বালাম চালের ভাত ও মুগের দালও) সম্পূর্ণরূপে পল্লীর উপর নির্ভর করিতেছে। পল্লী মরিলে, তাঁহারা কি ইট-কাঠ পাথর-মোটর-স্ত্রীর গহনা ও কোম্পানীর কাগজ চর্ব্বণ করিয়া প্রাণধারণ করিবেন? ভীমকায় নগরাসুরকে খাওয়াইবার জন্য শেষ রাত্রিতে ম্রিয়মাণ পল্লী হইতে দুধ, মাছ, তরকারী প্রভৃতি খাদ্য সম্ভার লইয়া মনোল্লাসে বাষ্পীয় শকট সহরাভিমুখে ছুটিয়াছে। পল্লী মরিলে কে এই বিরাট দৈত্যের খোরাক যোগাইবে?

আর বসিয়া মজা দেখিবেন না—কায়মনোপ্রাণে পল্লী উদ্ধার ব্রতে লাগিয়া যান। মানুষ যাহা করিয়াছে, মানব কেন তাহা করিতে পারিবেনা? প্রতীচ্য জগতে বহু ব্যাধি পীড়িত অস্বাস্থ্যকর স্থানও এক্ষণে অমরাবতী সদৃশ বলবীর্য্যপ্রদ সুন্দর স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণত হইয়াছে। সুয়েজ ও পানামা খাল মানুষেই কাটিয়াছে, আর আমাদের দেশের মানুষ কি তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের খাত দীঘিপুকুরের পঙ্কোদ্ধার করিতে পারিবে না? নিবিড় বন জঙ্গল পাহাড় কাটিয়া মানুষেই রেলবর্ত্ম লইয়া গিয়াছে; আর আমাদের দেশের মানুষ কি নিজ নিজ জন্মভূমি ক্ষুদ্রপল্লীর বনঝোপ কাটিয়া স্থানটিকে বাসোপযোগী করিতে পারিবে না? প্রচেষ্টা, একাগ্রতা, অধ্যবসায় ত্যাগ, একতা, সহযোগিতা ও সমবায়ের ফল অবশ্যই ফলিবে। সাধন-সমরে কর্ম্মকেশরী নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিবে। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন'—এই বাণীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, ত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, হৃদয়ে

অসীম সাহস, উদ্যম ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ধারণ করিয়া পল্লীউদ্ধারে লাগিয়া দেখুন, আন্তরিক যত্ন ও পরিশ্রমের পুরস্কার মিলে কি না।

যাঁহারা ইংরাজীনবিশ ও পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন তাঁহারা যেন স্থিরচিত্তে একটীবার ভাবিয়া দেখেন যে প্রতীচ্য জগতে Back to the country, back to the land এই মঙ্গল বাণী উদ্‌ঘোষিত হইতেছে সে দেশের মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণ বুঝিয়াছেন যে, সহরগুলি শিল্প বাণিজ্য ব্যবসায়াদির কর্ম্মকেন্দ্র হইলেও, স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ-জীবনপ্রার্থী মানবকে ধূম-ধূলি আকুলিত অতি কোলাহল আলোড়িত কৃত্রিমতা মণ্ডিত জনতাপূর্ণ অগ্নিতুল্য নগর পরিত্যাগ করিয়া স্বভাবসুন্দর সত্ত্বগুণ-প্রধান উদ্বেগ বিহীন আনন্দময় পল্লীর শান্তিময় সুশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় লইতেই হইবে। তাঁহাদের মনে লাগিয়াছে যে, কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষ না হইলে শুধু বিজ্ঞান-বলে উদ্ভাবিত শুষ্ক নীরস যন্ত্রে মানবের ক্ষুৎপিপাসা দূর করিতে পারিবে না, এজন্য তাঁহারাও পল্লী উদ্ধারে বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন। তাহা হইলে, আমাদের দেশের ইংরাজী শিক্ষিত মার্জ্জিত রুচি সুসভ্য নগরবাসী ভদ্র মহোদয়গণ কি স্বীয় জন্মভূমি পল্লী জননীকে এখনও অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন পাপ পঙ্কময় কণ্টকাকীর্ণ 'পাড়াগাঁ' বলিয়া ঘৃণা করিবেন? স্বদেশ ও স্বজাতি-বৎসল ইংরাজ জ্ঞানশিক্ষা ও অর্থোপার্জ্জনের জন্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রাণ পড়িয়া থাকে আপনার প্রিয়তম জন্মভূমি গ্রেটব্রিটেনের পল্লীগ্রামে। আর আমাদের দেশের ইংরাজী-শিক্ষিত মহাজনেরা স্বীয় জন্মভূমি পল্লীকে একবারে ভুলিয়া সহরে নগরে পয়সা রোজগার করিতেছেন—পল্লীর নাম উচ্চারণ করিতে, কিংবা "পল্লী আমার পূর্ব্ব নিবাস" এ কথা বলিতেও যেন ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করেন।

পল্লীর প্রতি বিধিই বাম দেখিতেছি, নতুবা পুত্র থাকিতে যে মাতার দুঃখ ঘুচিল না, তাঁহাকে আর ভাগ্যবতী কোন্ মুখে বলিব? পল্লী মাতার যে সন্তানগুলি বিদ্যা বুদ্ধি ও জ্ঞান বলে উচ্চ স্থান অধিকার পূর্ব্বক মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছেন, তাঁহারা আর দুঃখিনী মাতার দুঃখ দারিদ্র্য মোচনে যত্নশীল নহেন—মায়ের প্রতি একবার ফিরিয়াও চাহেন না। কি বিচিত্র কালের ধর্ম্ম! তাঁহারা বড় লোক হইয়া সহরের বড়লোক সমাজের অন্তর্ভূত হইয়া যাইতেছেন, স্বীয় জন্মভূমি অনাথা পল্লীমাতার চোখের জল মুছাইতেছেন কই? পল্লীমাতা তাই অশ্রুধারায় অরণ্যে রোদন করিতেছেন—শিরে করাঘাত করিয়া করুণ স্বরে বিলাপ করিতেছেন:—"হায়! কতকগুলি প্রাচীন কৃতঘ্ন পশু প্রসব ও পালন করিয়া আমার কাঁদিতেই জন্ম গেল—সুখ ভোগ আর ভাগ্যে ঘটিল না॥

আচমন ও প্রাণায়ামে আয়ুর্ব্বেদ।

[শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ বেদান্ত শাস্ত্রী]

—:০:—

১ম

আচমন সকল ধর্ম্ম কার্য্যেরই অঙ্গ। ভোজনের পূর্ব্বে অবশ্য করণীয়। আচমন না করিয়া অন্ন ভোজন (অবশ্য বর্ত্তমান সময়েও) দ্বিজের পক্ষে নিষিদ্ধ। কিন্তু যে কোন খাদ্য দ্রব্য গ্রহণের (ভোজনের) পূর্ব্বে আচমনের বিধি। আচমন অন্নের (খাদ্য দ্রব্যের) বাস বা আচ্ছাদন। বাস বা আচ্ছাদন যেমন উপরে ও নিম্নে দুই প্রকার, আচমনও তাই ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে "আস্তরণ ও পিধান" ভেদে দুই রকম। দ্বিবিধ প্রমাণ যথা।

"অমৃতোঽপিস্তরণ মসি"

"অমৃতপিধান মসিস্বাহা"

জলই অমৃত। সেই জলই অন্নের আস্তর (পাতিবার বস্ত্র যথা গালিচা সতরঞ্চি প্রভৃতি) হউক ইহাই ভোজনের পূর্ব্বের প্রার্থনা। জলই আবার ভোজনের শেষে পিধান অর্থাৎ আচ্ছাদন স্বরূপ হউক; ইহা ভোজনের পরের প্রার্থনা। আচ্ছাদন (ঢাকনি দ্রব্য) খুলিয়া ভোজনের পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ জলপান এবং ভোজনের শেষে অন্ততঃ কিঞ্চিৎ জলপান অবশ্য কর্ত্তব্য—এই ধর্ম্ম, কর্ত্তব্য এবং স্বাস্থ্য বিষয়ে নিরতিশয় উপকারক।

খাদ্য দ্রব্য যত সত্বর দ্রবীভূত হইয়া আইসে, খাদ্য দ্রব্যের কাঠিন্য যত সত্বর দূর হয়, তাহাই কর্ত্তব্য। কারণ কাঠিন্য দূর হইলে, তরল এবং দ্রবীভূত হইয়া আসিলে সহজে এবং দ্রুত গল-নাল পথে প্রবেশ করিতে পারে। এটি জীর্ণতার পক্ষে যে বিশেষ সুবিধা হয়—তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

"প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা এবং সমানায় স্বাহা।" এই পাঁচটি মন্ত্রে অন্নগ্রাস গ্রহণের বিধি। প্রাণ অপানাদি পাঁচটি বায়ু জীব-শরীরে বর্ত্তমান। প্রাগ্‌গমনশীল বায়ুই প্রাণ। নিম্ন গমনশীল বায়ু অপান। ঊর্দ্ধগমনস্বভাব বায়ু উদান। সর্ব্বশরীরব্যাপী বায়ু ব্যান। সমীকরণশীল—অর্থাৎ পরিপচনকর্ত্তা বায়ু সমান।

আচমনের পূর্ব্বে অন্নের কিঞ্চিৎ অগ্রভাগ ত্যাগ বিধেয়। অগ্রভাগেই যত কিছু দোষ থাকে, যাহা কিছু পড়িবার সম্ভাবনা উপরি-ভাগেই থাকে। ঐ অগ্রভাগ জীবকে দান করার ব্যবস্থা আচমনে দৃষ্ট হয়। যে খাদ্য-দ্রব্য এত প্রিয়, ক্ষুধার, সময়েও সেই খাদ্য-দ্রব্যের অগ্রভাগ অগ্রে জীবের উদ্দেশে দান করা—কি উদার স্বার্থত্যাগের ব্যবস্থা, কিবা মহান্ সংযমের শিক্ষা!

ক্ষুধার প্রকোপে পরিশ্রমের শান্তিতে কণ্ঠনালী শুষ্ক হইয়া সারা শরীরে পাকস্থলীতে একটি উষ্ম তাপ দেখা যায়। আচমনের জলে

সেই উষ্ণতা দূরীভূত হয় এবং কণ্ঠনালী সরল হইয়া উঠে। অল্পে অল্পে কণ্ঠ ভিজাইলে গলনালী-পথ পরিষ্কৃত হইয়া আসে। ফলে খাদ্য প্রবেশের কোন ব্যাঘাত জন্মে না, গলায় গলায় বাধিয়া যাইবার ভয় থাকে না, হঠাৎ উহা পাকস্থলীতে পড়িয়া কোনপ্রকার বিষম ফল উৎপাদিত হইতে পারে না।

ভোজনের পূর্ব্বে কেবল অন্ন অর্থাৎ শুধু ভাত পঞ্চগ্রাসে খাওয়ার ব্যাপারে কেবল যে জীর্ণতার সুবিধা হয় তাহা নহে, প্লীহা-যকৃতাদি আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। একটি সন্ন্যাসী আমাকে প্লীহা রোগের একটি মুষ্টিযোগ শিখাইয়া দেন। বলেন—ভোজনের পূর্ব্বে বড় বড় পঞ্চগ্রাস শুধু ভাত খাইয়া লইবে, তৎপরে ব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিবে। ঐ আচমনটিই বড় বড় গ্রাসে ব্যবস্থিত হইল। বলা বাহুল্য আমি তাহা করিতাম এবং তাহার ফলেই হউক আর অন্য কারণে হউক, আমার প্লীহা সারিয়া গেল।

দম্পতী জীবন।

স্তন্য তত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি—গত বর্ষের পর হইতে)

[কবিরাজ শ্রীদ্বারকানাথ সেন কাব্য-ব্যাকরণ-তর্কতীর্থ]

—:•:—

শিশুর যত প্রকার খাদ্য দ্রব্য আছে, তাহার মধ্যে স্তন দুগ্ধই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু তাহা বিশুদ্ধ না হইলে শিশুর পক্ষে হিতকর না হইয়া, অশেষবিধ রোগেরই কারণ হইয়া থাকে, এই জন্য দুগ্ধ বিশুদ্ধ কিনা—সে দিকে লক্ষ্য করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক না হইতে পুনর্ব্বার ভোজন করা, কুপথ্য ভোজন, কোন দিন বেশী—কোন দিন বা কম এবং ঠিক সময়ে না খাওয়া, মৎস্য,মাংস, দুগ্ধ প্রভৃতি বিশুদ্ধ দ্রব্যের এককালে ভোজন, অতিমাত্রায় ভোজন, লবণ, অম্ল, ঝাল, ক্ষারদ্রব্য এবং পচাদ্রব্যের অতি সেবন, মানসিক দুঃখ, শরীরের সন্তাপ, রাত্রিজাগরণ, চিন্তা, মলমূত্রের বেগধারণ বা বেগ না আসিলেও বেগ প্রদান, গুড় কৃত পরমান্ন, দধি, মৎস্য, ছাগাদি গ্রাম্যমাংস, বা কচ্ছপাদি জলজমাংস বা শূকরাদি আনুপ-মাংসের অতি ভোজন, প্রত্যহ আহারের পরই দিবা নিদ্রা, অতিশয় মদ্যপান, পরিশ্রম-হীনতা, লগুড়াদি দ্বারা আঘাত, ক্রোধ এবং রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া শরীরের ক্ষয় প্রভৃতি কারণে বায়ু, পিত্ত এবং কফ প্রকুপিত হইয়া দুগ্ধবাহিনী শিরা সকলকে আশ্রয় করতঃ দুগ্ধকে দূষিত করে। এই স্তন্য দোষ আট

প্রকার, যথা বৈরস্ত, ফেনিলতা ও রুক্ষতা, বৈবর্ণ্য, দৌর্গন্ধ্য, স্নিগ্ধতা, পিচ্ছিলতা ও গুরুতা।

ইহার মধ্যে স্তন্যের ফেনিলতা ও রুক্ষতা—এই দোষ দুইটী কেবল দুষ্ট বায়ুর দ্বারা উৎপন্ন হয়। কিন্তু কুপিত বায়ু ইহার কারণ হইলেও ইহার সহিত পিত্ত ও কফের কিছু সম্পর্ক থাকে।

স্তন্যের বৈবর্ণ্য ও দৌর্গন্ধ্য প্রধানতঃ পিত্তের দোষেই হইয়া থাকে, তবে বৈবর্ণ দোষে বায়ু ও কফের এবং দৌর্গন্ধ্যে কেবল কফেরই সম্বন্ধ থাকিতে পারে।

দুষ্ট কফের দ্বারা স্তন্যের স্নিগ্ধতা, পিচ্ছিলতা ও গুরুতা দোষ জন্মে।

এই আটপ্রকার দোষের উৎপত্তি ক্রম-লক্ষণ ও চিকিৎসার্থ ঔষধ লিখিত হইতেছে,

(১) বায়ু রুক্ষাদি নিজ প্রকোপক কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া দুগ্ধাশয়কে আশ্রয় করতঃ স্তন্যের স্বাভাবিক বিকৃতি করিয়া থাকে, সেই বায়ু সংসৃষ্ট বিরস দুগ্ধ পান করিলে শিশু কৃশ হয়। উহার দুগ্ধে রুচি থাকে না এবং উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শীঘ্র পুষ্ট না হইয়া দীর্ঘ-কালে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। (স্তন্যের বৈষম্য দোষের লক্ষণ।)

নারীর দুগ্ধ বিরস হইলে দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, অনন্তমূল ও ক্ষীরকাকোলী প্রত্যেক দ্রব্য সমান পরিমাণে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ চারি আনা মাত্রায় সকালে একবার ও বৈকালে একবার গরম জল সহ পান করিবে।

পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা, শুঁঠ ও বনকুলথ কলায়, সমান ভাগে ভাল করিয়া বাটিয়া তাহার দ্বারা স্তনদ্বয়ের উপর প্রলেপ দিতে হইবে, উহা ধুইয়া ফেলিয়া নিঃশেষরূপে দুধ গালিয়া ফেলিবে। এইরূপ কিছু দিন করিলে স্তন্যের বিরসতা দোষ দূর হয়।

(২)

বায়ু কুপিত হইয়া দুগ্ধকে অন্তরে মথিত করে, সেই কারণে স্তন্যের ফেনিলতা দোষ জন্মে, ইহাতে দুগ্ধ অল্প পরিমাণে কষ্টে নির্গত হয়। এই দুগ্ধ পান করিলে শিশুর স্বরভঙ্গ অথবা ক্ষীণ স্বর হয়, মল ও মূত্রের বিবন্ধ—বায়ু জন্য শিরোরোগ এবং পীনস (সর্দ্দি) হইয়া থাকে।

এই দোষে প্রসূতিকে আকনাদি, শুঁঠ, কাকজঙ্ঘার মূল ও মূর্ব্বা, এই কয়টী দ্রব্য চূর্ণ করিয়া সমানভাগে মিশাইয়া একসিকি পরিমাণে ঐ চূর্ণ সকালে ও বৈকালে দুইবেলা গরম জল দিয়া খাইতে দিবে।

রসাঞ্জন, তগরপাদুকা, দেবদারু, বেলেরমূল, ও প্রিয়ঙ্গু সমানভাগে জল সহ বাঁটিয়া স্তনদ্বয়ে প্রলেপ দিতে হইবে, প্রলেপ শুষ্ক হইলে ধুইয়া দুগ্ধ গালিয়া ফেলিবে। ইহাতে দুগ্ধ শোধন হইবে।

চিরতা, শুঁঠ ও গুলঞ্চের ক্বাথ পান করিলে স্তন্য শোধন হয়। (ক্বাথ পাচনবৎ ব্যবস্থেয়)।

এইরূপ দুগ্ধ শোধনের জন্য যব, গম, শ্বেত সর্ষপ বাঁটিয়া পূর্ব্ববৎ লেপন দিবে।

(৩)

দুষ্ট বায়ু দুগ্ধের স্নেহভাগ শোষণ করিলে উহা রুক্ষ হয়, সেই দুগ্ধ পান করিলে শিশুর বল কমিয়া যায় এবং শরীর কর্কশ (খস্‌খসে) হয়।

আকনাদিমূল শুঁঠ, দেবদারু, মুথা, মূর্ব্বা,

(মুগরো), গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, চিরতা, কটকী, অনন্তমূল এই দশটী দ্রব্যের সহিত গোদুগ্ধ পাক করিয়া খাইলে স্তন্যের রুক্ষতা দোষ দূর হয়।

ঐ দশটী দ্রব্যের কাথ ও কল্ক দিয়া ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত খাইলে এই রোগে বিশেষ উপকার হয়।

বেলছাল,শোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুল-ছাল ও গণিয়ারী ছাল অথবা শালিপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর একত্র বাঁটিয়া ঈষৎ গরম করিয়া পূর্ব্ববৎ লেপন দিলে স্তন্যের রুক্ষতা দূর হয়।

এই রোগে জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী মুগানি, মাষানি, জীবন্তী ও যষ্টিমধু, উক্ত প্রলেপও হিতকর।

(৪)

যে প্রসূতি লবণ, ঝাল, অম্ল, গরম দ্রব্য প্রভৃতি অতিমাত্রায় সেবন করেন, পিত্ত কুপিত হইয়া তাঁহার দুগ্ধাশয়কে আশ্রয় করিয়া দুগ্ধের বৈবর্ণ্য উৎপাদন করে, ইহাতে দুগ্ধ নীল, হলদে, কাল প্রভৃতি বর্ণ ধারণ করে, শিশু সেই দুগ্ধ পান করিলে তাহার গাত্র বিবর্ণ ও ঘর্ম্মযুক্ত হয়, পিপাসা হয়, পাতলা দাস্ত হয়, সর্ব্বদা শরীর গরম হইয়া থাকে, শিশু ঐ দুগ্ধ খাইতে চাহে না।

যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্‌, ক্ষীরকাকোলী ও নিসিন্দা মূল প্রত্যেক দ্রব্য এক আনা একত্র বাঁটিয়া শীতল জলের সহিত সকালে ও বৈকালে পান করিলে দুগ্ধের বিবর্ণতা নষ্ট হয়।

দ্রাক্ষা ও যষ্টিমধু বাঁটিয়া স্তনে লেপন দিতে হয়। প্রলেপ শুষ্ক হইলে জল দিয়া ধুইয়া পুনঃ পুনঃ গালিয়া ফেলিবে।

(৫)

বাসি-পচা প্রভৃতি দ্রব্যের সেবন হেতু পিত্ত খারাপ হইলে দুগ্ধের দুর্গন্ধতা হয়, তাহা পান করিলে শিশুর পাণ্ডুরোগ ও কামলা হইয়া থাকে।

মেষশৃঙ্গী, অজশৃঙ্গী, আমলা, হরীতকী, বহেড়া, হরিদ্রা ও বচ মিলিত একসিকি বাঁটিয়া জল মিশ্রিত দুগ্ধের সহিত পান করিলে দুগ্ধের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

প্রসূতি পথ্যাশিনী হইয়া হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল ও গোলমরিচের চূর্ণ মধুর সহিত আলোড়ন করিয়া পান করিবেন।

অনন্তমূল, বেণারমূল, মঞ্জিষ্ঠা, চাল্‌তা ও রক্তচন্দন কিংবা তেজপাতা, রক্তচন্দন ও বেণারমূল বাঁটিয়া স্তনের উপর প্রলেপ দিবে। শুষ্ক হইলে ধুইয়া দুধ গালিয়া ফেলিতে হইবে।

(৬)

শ্লেষ্মগুরু প্রভৃতি কারণে কুপিত হইয়া প্রসূতির দুগ্ধাশয়কে অধিকার করে এবং নিজের স্নেহগুণ দ্বারা দুগ্ধকে অতিশয় স্নেহান্বিত করে। এই অতি স্নিগ্ধ দুগ্ধ পান করিলে শিশুর বমি, কুঁথুনী ও লালাস্রাব হয়। আর শিশুর সূল শিরা সকল শ্লেষ্মলিপ্ত হওয়াতে অতিশয় নিদ্রা ও আলস্য, শ্বাস, কাস এবং তমক শ্বাস হইয়া থাকে।

স্তনদুগ্ধ স্নিগ্ধতা দোষে দূষিত হইলে দেবদারু, মুথা, আকনাদিমূল ও সৈন্ধবলবণ একত্র বাটিয়া গরম জলের সহিত পান করিলে সত্বর স্তন্যদোষের শান্তি হয়।

দূষিত কফ ঐভাবে দুগ্ধকে দূষিত করিয়া উহার পিচ্ছিলতা দোষ উৎপাদন করে। ঐ পিচ্ছিল দুগ্ধ পান করিলে শিশুর লালাস্রাব, মুখ, চক্ষু শোথযুক্ত ও জড়তা হইয়া থাকে।

স্তনদুগ্ধ পিচ্ছিল হইলে কাকজঙ্ঘা, হরীতকী ও বচ; কিংবা মুথা, শুঁঠ ও আকনাদি মূল বাটিয়া গরম জল সহ পান করিবে।

এই দোষে ভূমি কুষ্মাণ্ড, বেলছাল ও যষ্টি-মধু পেষণ করিয়া স্তনে লেপন দিতে হইবে।

(৮)

দুষ্ট কফ দুগ্ধাশয়স্থ হইলে নিজের গুরুত্ব-গুণে দুগ্ধের গুরুতা দোষ ঘটাইয়া থাকে। ঐ দুগ্ধ পান করিলে সন্তানের হৃদ্রোগ জন্মে এবং কফ জন্য রোগ হইয়া থাকে।

স্তনদুগ্ধ গুরু হইলে প্রসূতি বলাডুমুর, গুলঞ্চ, নিমছাল, পল্‌তা, আমলা, হরীতকী ও বহেড়ার কাথ পান করিবে।

পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল ও শুঁঠের কাথ ও এই দোষে হিতকর।

দুগ্ধের গুরুত্ব দোষ নিবারণের জন্য বেড়ালামূল, শুঁঠ, কাকজঙ্ঘা, মূর্ব্বা পেষণ করিয়া স্তনে প্রলেপ দিবে।

চাকুলে ও ক্ষীরকাকোলীর লেপনও দুগ্ধের গুরুতা দোষ দূর করিয়া থাকে।

(দুগ্ধ শোধনার্থ সামান্যতঃ কয়েকটি যোগ),—

(১) আকনাদিমূল, শুঁঠ, দেবদারু, মুথা, মুগ্‌রো, (মূর্ব্বা) গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, চিরতা, কট্‌কী ও অনন্তমূল।

(২) কাকজঙ্ঘা, ছাতিমছাল, অশ্বগন্ধা।

(৩) গুলঞ্চ ও ছাতিমছালের কাথে, শুঁঠচূর্ণসহ।

(৪) বেলছাল, শোনাছাল, গাম্ভারী ছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালিপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর।

ইহাদের মধ্যে যে কোনটী যোগের পাচন করিয়া খাইলেও সকল প্রকার স্তন্য দোষে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

দুগ্ধ জনন দ্রব্য

প্রসূতির দুগ্ধ কম হইলে নিম্নলিখিত দ্রব্য-গুলি ভোজন করিলে উহা বর্দ্ধিত হয়। মাংস, শাক, অধিক মিষ্ট, অম্ল, ও দুগ্ধ।

ভূমি কুষ্মাণ্ডের চূর্ণ মদ্যের সহিত অথবা রামশালি, গোকুলশালি প্রভৃতি শালি ধান্যের চাউল গোদুগ্ধ সহ বাঁটিয়া খাইলে জননীগণের স্তন্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চাকুলে, ইন্দ্রযব ও যষ্টিমধু, অথবা বচ, মুথা, আতইচ, হরীতকী, দেবদারু ও নাগেশ্বর এই সমস্ত দ্রব্যের পাচন করিয়া খাইলেও দুগ্ধ বর্দ্ধিত হয়।

বিশুদ্ধ দুগ্ধের লক্ষণ

দুগ্ধ যদি শীতল, নির্ম্মল, পাতলা, শ্বেতবর্ণ এবং জলে নিক্ষেপ করিলে জলের সহিত মিশিয়া যায়, ফেন যুক্ত হয় এবং তাহাতে সূতা না কাটে, তাহা হইলে সে দুগ্ধ বিশুদ্ধ। ইহার বিপরীত হইলে তাহা দোষযুক্ত জানিবে।

উড়ুম্বর।

(রিপোর্টারের পত্র)।

—:o:—

কলিকাতার আয়ুর্ব্বেদ সভায় উদ্যোগে গত ১লা মাঘ সোমবার কলেজ স্কোয়ার থিওসফিকেল হলে 'উড়ুম্বর-পত্রের গুণ আবিষ্কার উপলক্ষে উক্ত সভার এক সাধারণ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সভায় কলিকাতার বিখ্যাত কবিরাজ, ডাক্তার ও ভদ্র মহোদয়গণ বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। বহু পত্রিকার সম্পাদকও উপস্থিত ছিলেন।

সর্ব্বপ্রথমে আয়ুর্ব্বেদ সভার স্থায়ী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথসেন সরস্বতী এম, এ, এল, এম, এস, মহাশয় যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"অদ্য আমি আপনাদের নিকট চিকিৎসক চূড়ামণি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর ধর মিশ্র মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। ইনি চম্পারণ জেলার অন্তর্গত রত্নমালা গ্রামের সদ্ ব্রাহ্মণ বংশ সম্ভূত সম্ভ্রান্ত জমিদার। ইনি বিপুল অর্থশালী হইয়াও পরোপকার ব্রতে নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ইনি জমিদারীর আয় হইতে যৎসামান্য মাত্র স্বীয় পরিজনবর্গের ভরণ পোষণার্থ গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট অর্থ দীন হীন মরণোন্মুখ রোগীর ঔষধের চিকিৎসার জন্য ব্যয় করিয়া থাকেন। এদেশে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। বৈদ্যক বিদ্যার উন্নতি কল্পে এই মহাত্মা স্বীয় জন্মভূমি রত্নমালা গ্রামে একটী আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উক্ত বিদ্যালয়ের সহিত একটী "আতুরাবাস" স্থাপন করিয়া রোগীদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান ও গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া দীন দরিদ্র রোগার্ত্তজনের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। বিদ্যার্থীগণের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত ও তাহাদের আহারের ব্যবস্থা করিয়া আয়ুর্ব্বেদের প্রভূত উপকার করিয়াছেন। উক্ত পণ্ডিত মহাশয়—ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের গুণাবিষ্কারে সর্ব্বদা রত থাকেন। নিখিল আয়ুর্ব্বেদ সমুদ্র মন্থন করিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে সম্প্রতি তিনি যে সকল ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। তন্মধ্যে ক্ষিপ্ত শৃগাল কুক্কুর দংশনজনিত বিষের ঔষধ, সর্প দংশন জনিত বিষের ঔষধ ও জলোদরের ঔষধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার আবিষ্কৃত ঔষধের মধ্যে আজ উড়ুম্বর পত্রের গুণ সম্বন্ধে তিনি আপনাদের নিকট তাঁহার অভিজ্ঞতার পরিচয় দিবেন,—"

আয়ুর্ব্বেদের অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থার দিক্‌দর্শন করাইবার নিমিত্ত উক্ত পণ্ডিত মহাশয় নিম্নলিখিত সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন,—

"আমি যদিও বাল্যকাল হইতে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলাম, কিন্তু আমার বিশ্বাস,

ছিল—আয়ুর্ব্বেদ অপূর্ণ শাস্ত্র, পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্র পূর্ণ। কারণ পাশ্চাত্য চিকিৎসা—আয়ুর্ব্বেদ ও ইউনানী প্রভৃতি প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রের সারাংশ লইয়া বহু পরীক্ষা ও গবেষণার পরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এজন্য আমার নিকট তখন যত রোগী আসিত, আমি তাহাদিগকে নিকটবর্ত্তী এলোপ্যাথিক ডিস্‌পেনসারীতে সাহায্য লইতে পাঠাইয়া দিতাম। ঐ ডিস্‌পেন্‌সারীতে ৫০।৬০ বৎসর বয়সের দুইটী জীর্ণজ্বর, গ্রহণী ও শোথগ্রস্ত রোগী পাঠাইয়াছিলাম, দুর্ভাগ্য বশতঃ ৬ মাসের মধ্যে উভয় রোগীই আমার প্রাণে আঘাত দিয়া ইহলোক ত্যাগ করে। কিছুদিন পরে আমার পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী উরুরোগে আক্রান্ত হইলেন। আমি তাঁহার মৃত্যুর আশঙ্কা করিয়া ব্যাকুল চিত্তে তাঁহার তীর্থযাত্রার ব্যবস্থা করিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ প্রভৃতি শুনান কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম। কিছুদিন পরে আমার একজন শিষ্যের পরামর্শে নিজে আয়ুর্ব্বেদ প্রণালীতে তাঁহার চিকিৎসা আরম্ভ করিলাম। অল্প দিনের মধ্যেই আমার মা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিলেন। ইহার পরে আমার একজন প্রজার জলোদর হইয়াছিল, সে ব্যক্তি ডাক্তারী চিকিৎসায় ব্যর্থমনোরথ হইয়া আমার নিকট আসিলে ভগবানের অনুগ্রহে আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসা করিয়া উক্ত রোগীকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। অষ্টাদশ বর্ষীয় একজন মুসলমান বালকেরও ৩ মাসের মধ্যে জলোদরের চিকিৎসায় সফলকাম হইয়াছিলাম। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমার বিশ্বাস হইল, আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এখনও বহু অমূল্য রত্ন নিহিত আছে। অতঃপর আমি বিশেষ সাহসের সহিত আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসা-কার্য্যে প্রাণমন সমর্পণ করিলাম। ভগবানের অনুগ্রহে আমার হাতে বহু রোগীর প্রাণ রক্ষা হইয়াছে—এই টুকু আমি বিনীত ভাবে আপনাদের কাছে নিবেদন করিতেছি। আমার নিজের গ্রাম ও তৎসন্নিহিত গ্রামের লোক সমূহের ধারণা হইল—আমি যাদুমন্ত্রে চিকিৎসা করি। কিন্তু বাস্তবিক আমার ঐরূপ কোন মন্ত্র নাই—যাহা কিছু আছে সমুদয় আয়ুর্ব্বেদের মাহাত্ম্যে। আপনারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন—আমার এরূপ খ্যাতি শুনিয়া স্থানীয় হাঁসপাতালের ডাক্তার মহাশয়ের ঈর্ষা হইল। তিনি জেলার কলেক্টর সাহেবের নিকট—আমার বিরুদ্ধে আমি অর্থ না লইয়া চিকিৎসা করিয়া হাঁসপাতাল ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছি—এই মর্ম্মে অভিযোগ করিলেন। সৌভাগ্যের বিষয়, কলেকটার সাহেব নিজেই আসিয়া আমার কার্য্য পদ্ধতি দেখিয়া প্রীত হইলেন এবং ডাক্তারের অভিযোগ আমার প্রশংসায় পরিণত হইল। তিনি আমার কার্য্যে বাধা না দিয়া বরং সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আমাকে বিশেষ রূপে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কমিশনার সাহেব আমার চিকিৎসা-প্রণালী দেখিয়া বড়ই পরিতৃপ্ত হইলেন ও বিদ্যালয়ের কার্য্যে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করিলেন। আমি তাঁহার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া নূতন নূতন ভেষজের আবিষ্কার কার্য্যে ব্যাপৃত হইলাম। জন সাধারণের সুবিধার জন্য আমার আবিষ্কৃত প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনাদিগের নিকট উপস্থিত করিব। [আগামীবারে সমাপ্য]।

প্রাচীন চিকিৎসকের পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।*

(পূর্ব্বানুবর্ত্তী)

[কবিরাজ শ্রীইন্দু ভূষণ সেন গুপ্ত এচ্, এম্, বি]

—:•:—

(৫৪) অজীর্ণ রোগে—ধনিয়া এক তোলা ও শুঁঠ এক তোলা ইহাদের ক্কাথ সেবনে অজীর্ণ ভাল হয়।

(৫৫) ত্রিফলা চূর্ণ সৈন্ধব লবণ সহ সেবনে অজীর্ণ উপশমিত হয়।

(৫৬) প্রত্যহ প্রাতঃকালে আদা, কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ সহ সেবন করিলে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় ও মন্দাগ্নি ভাল হয়।

(৫৭) যোয়ান ও শুঁঠ উভয়ে এক তোলা লইয়া ⁄।৹ এক পোয়া জলে সিদ্ধ করতঃ ⁄৹ ছটাক থাকিতে নামাইয়া সেবন করিলে অজীর্ণ, পেটফাঁপা চুঁয়া ঢেকুর প্রভৃতি নষ্ট হয়,। উপরোক্ত মুষ্টিযোগ চারটী আমাদের বিশেষ পরীক্ষিত।

(৫৮) হিক্কায়—পলতার রস এক তোলা ও আমলকীর রস এক তোলা মধুর সহিত পান করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়।

(৫৯) শুঁঠ চূর্ণ সহ গরম গরম ছাগদুগ্ধ পান করিলে হিক্কা নষ্ট হয়।

(৬০) শ্বাসে শ্বেত ধুতুরার শুষ্ক ফুল গুঁড়া করিয়া কাগজের দ্বারা চুরুট করিয়া তাহার ধূম পান করিবে শ্বাস ভাল হয়। ইহা ব্যবহারে আমরা অনেক স্থলে বিশেষ উপকার পাইয়াছি।

(৬১) পিপাসায়—পুরাতন ইক্ষু গুড়ের সহিত দধি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে আশু পিপাসার নিবৃত্তি হয়। দাহ রোগে—ধনিয়ার কাথ চিনির সহিত প্রত্যহ প্রাতঃকালে পান করিলে দাহ ও তৃষ্ণা নষ্ট হয়।

(৬২) উপদংশে—সাদা ধুনার গুঁড়া ও মাখম—সম পরিমাণে মর্দ্দন করিলে উপদংশের ঘা শুকাইয়া যায়।

(৬৩) বামন হাটির মূল, আপাঙ্গ মূল, চন্দন, মনঃশিলা এই সকল পোষণ করিয়া ঘৃত সহযোগে প্রলেপ দিলে উপদংশের ক্ষত ভাল হয়।

(৬৪) সোণাছাল, নিমছাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ইহাদের ক্বাথে, গুগ্‌গুলু ও ত্রিফলা চূর্ণ ⁄৹ আনা প্রক্ষেপ দিয়া ৫।৭ দিন পান করিলে উপদংশের বিষ নষ্ট হয়। ইহা ব্যবহারে আমরা অনেক স্থলে বিশেষ উপকার পাইয়াছি।

(৬৫) বসন্তে—পিড়কা সকল সম্পূর্ণরূপে উন্নত না হইলে কাঁচা হরিদ্রার রস, মাখমের সহিত মিশ্রিত করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিবে।

(৬৬) বসন্তের প্রথম অবস্থায়—মেথী

* আমার পিতামহ ইটালির স্বনামধন্য স্ববিকর্ম্ম কবিরাজ স্বর্গীয় ঈশ্বর চন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের পরীক্ষিত ঔষধাবলীর জীর্ণ খাতা হইতে সংগৃহীত।—লেখক।

ভিজান জল, কুড় ও বাবুই তুলসীর ক্বাথ অথবা কুড়, বাবুইতুলসীর শিকড় ও মানকচুর শিকড়ের ক্বাথ সেবন করিলে উপকার হয়।

(৬৭) বসন্তের প্রথমাবস্থায় কুমুরিয়া লতার ক্বাথে ৵৹ আনা পরিমিত হিং প্রক্ষেপে দিয়া সেবন করিলে উপকার হয়।

(৬৮) বসন্তের প্রথমাবস্থায় জয়ন্তী অথবা শিকটী মূল—ঘৃত ও পর্য্যুসিত জলের সহিত পান করিতে হইবে।

(৬৯) সুপারীর মূল কিম্বা মরিচ ও ময়না ফল অথবা মরিচ ও নাটাকরঞ্জার মূল বাসি জলের সহিত প্রয়োগ করা বসন্তের প্রথমাবস্থায় উপকারী।

(৭০) শ্বেত চন্দন ঘষা ৵৹ আনা ও অর্দ্ধ ছটাক হিঞ্চেশাকের রস পান করিলে বসন্তের স্ফোটকগুলি ভাসিয়া উঠে।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ প্রসঙ্গ।

—:o:—

শোক সংবাদ।

আমরা শোক সন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, গত ১০শে পৌষ বুধবার রাত্রি ৪ ঘটিকার সময় দুবলহাটীর বিখ্যাত বড় রাজকুমার ঘনদা নাথ রায় বাহাদুর পরলোক প্রস্থান করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৩৭ বৎসর হইয়াছিল। স্বধর্ম্মপরায়ণতা, আশ্রিত বাৎসল্য, অতিথি সেবা, দীনপালন, পরোপকার প্রভৃতি রাজোচিত গুণে দুবলহাটির রাজবংশ চিরকালই বঙ্গদেশের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। স্বর্গগত কুমার বাহাদুর বংশোচিত সমস্ত গুণেরই অধিকারী ছিলেন। ইঁহার স্বর্গীয় পিতা রাজা হর নাথ রায় বাহাদুর রাজসাহী কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য লক্ষাধিক মুদ্রা মূল্যের ভূসম্পত্তি গভর্ণমেণ্টকে প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই প্রচুর অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত বোয়ালিয়া "তমনো যন্ত্রে" বিশ্রুত "হিন্দুরঞ্জিকা" মুদ্রিত হইয়া অদ্যাপি গৌরবের সহিত সমগ্র বঙ্গদেশে বিবিধ ধর্ম্মালোচনার পথ সুগম করিয়া আসিতেছে। পিতৃদেবের আচরিত পন্থানুসরণে উক্ত কুমার বাহাদুর দেশের ও সাধারণের বিবিধ হিতানুষ্ঠান রত ছিলেন। প্রজামণ্ডলীর হিতার্থ রাজধানীতে প্রথম শ্রেণীর এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন ইঁহাদের অন্যতম সাধারণ কীর্ত্তি। আমাদের অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল দাস গুপ্ত কাব্যতীর্থ কবিভূষণ মহাশয় উক্ত রাজ বংশের পারিবারিক চিকিৎসক পদে দীর্ঘ ২০শ বর্ষ ব্যাপিতকাল বর্ত্তমান ছিলেন। আমরা তাঁহার মুখে বহু দিন হইতেই স্বর্গীয় কুমার বাহাদুরের বিবিধ সদগুণের কথা শুনিয়া আসিয়াছি। তাঁহার অমায়িক উদার চরিত্রে ইতর, ভদ্র সকলেই প্রীতিলাভ করিত। সর্ব্বসাধারণের উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি নিজ বাটীতে উচ্চ ইংরজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঐ বিদ্যালয়ে বহুদূরাগত নিঃস্ব ছাত্রগণ রাজানুকূল্যে শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হইতেছে।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত
ও ১৭।১৯নং শ্যামবাজার ব্রিজ্ রোড্ হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৭ম বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩২৯ সাল। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

ধ্বংসের পথে বাঙ্গালী।

(ডাক্তার শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু-কাব্যবিনোদ)

—•:০:•—

বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে গেলেই আতঙ্কে প্রাণ শুকাইয়া যায়, বাঙ্গালী উচ্চ শিক্ষা পাইতেছে, সভ্য হইতেছে, সভ্যজগতে সভ্য বলিয়া পরিচয় দিতেছে, কিন্তু এদিকে তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। বিদেশ হইতে যে কেহ আসুক, সে একবার বাঙ্গালীর উপর তাহার প্রভুত্ব খাটাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। ফল্ কথা, বাঙ্গালী সকলের নিকটেই যেন সরকারী নাগর হইয়া পড়িয়া আছে, যে আসিবে, সেই একবার ইহাকে পিটিয়া যাইবে। ব্যাধিগুলিও বাঙ্গালার মাটিতে কি মধু যে পাইয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারি না। বাঙ্গালায় একবার যে ঢুকিতেছে সেই কায়েমী মৌরসী জমা লইয়া চিরদিনের জন্ত থাকিয়া যাইতেছে, তাহাকে তাড়াইবে এমন শক্তি কা'র?

গভর্ণমেণ্টের সেনসাস রিপোর্ট হইতে আমরা দেখিতে পাই, ১৯১১ সালের মার্চ্চমাসের গণনা অনুসারে সমগ্র ভারতে লোকসংখ্যা একত্রিশ কোটী একান্ন লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার তিনশত ছিয়ানব্বই ছিল, ১৯২১ মার্চ মাসের গণনায় মোটামুটি একত্রিশ কোটী নব্বই লক্ষ হইয়াছে অর্থাৎ দশবৎসরে মাত্র ৩৯ লক্ষের কিছু উপরে বাড়িয়াছে। কিন্তু ১৯০১ হইতে ১১ সালে দুইকোটী আটলক্ষ লোক বাড়িয়াছিল, গত দশবৎসরে লোক বাড়িয়াছে শতকরা ১·২৩ জন, তৎপূর্ব্ব দশবৎসরে বাড়িয়াছিল শতকরা ৭ জনের বেশী। পাঠক দেখিবেন, এই হতভাগ্য পরাধীন দেশে জন্মের হার কেমন ভাবে কমিয়া যাইতেছে! পরাধীনতার অবসাদ দুর্দ্দম্য দারিদ্র্যের সহিত ঘোর সংগ্রামে জীবনীশক্তির দ্রুত অপচয়, আর কলেরা-ইনফ্লুয়েঞ্জা বসন্ত-ম্যালেরিয়া ইত্যাদি

ব্যাধির তাণ্ডবলীলা—ইহাই কি যথেষ্ট কারণ নহে।

আবার স্বাধীন দেশের সহিত তুলনা করিয়া দেখুন—ইংলণ্ড ও ওয়েলসের লোক-সংখ্যা ১৮৪১ সালের গণনায় শতকরা ১৪'২, ১৮৫১তে ১২'৬; ১৮৬১তে ১১'৯, ১৯৭১তে ১৩'২, ১৮৮১তে ১৪'৩, ১৮৯১তে ১১'৬, ১৯০১ এ ১২'১, এবং ১৯১০য়ে ১০'৯ বাড়িয়া ছিল।

বাঙ্গালায় মৃত্যুর হারই বা কি ভীষণ! বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের মিউনিসিপাল বিভাগ হইতে ১৯১৯ সালের জন্মমৃত্যুর যে তালিকা বাহির হয়, তাহাতে প্রকাশ, গত পূর্ব্ব বৎসরের জন্মসংখ্যা অপেক্ষা মৃত্যুসংখ্যা ৩৯৬০০০ বেশী। কলেরায় মৃত্যুর সংখ্যা ১,২৫০০০, বসন্তে ৩৭০০, জ্বরে ১২,২৯০০০। শিশুমৃত্যুর হার আরও ভয়ানক। যেখানে বিলাতে হাজার করা ৯০, স্কটল্যাণ্ডে ৯৭ অথবা আয়ারলণ্ডে ৮৩, সেখানে বাঙ্গালা দেশে হাজার করা ১০৫ (কলিকাতায় ২৫০) শিশু মারা যায়। বাঙ্গালী অদৃষ্টবাদী, তাই সে মনে করে সবই অদৃষ্টের ফল, নিয়তির গতিরোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই, ঈশ্বর যেন শুধু ভারত-বাসী—তথা বাঙ্গালীর জন্যই অদৃষ্ট ও নিয়তির সৃষ্টি করিয়াছেন। বাঙ্গালী এমনি অপদার্থ, শক্তিহীন, 'জড়ভরত' হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহার একবার বাঁচিবার ইচ্ছা হয় না, কখনও সে মনে করে না যে, একবার গা'ঝাড়া দিয়া উঠি, জীবন-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হই। সে নিতান্ত অসহায়ের মত আপন ইচ্ছায় কৃতান্তের জালের ভিতরে যাইয়া ধরা দিতেছে।

চীনদেশে অকাল মৃত্যুর হার বাড়িয়া গিয়াছে, সেথানকার লোকসংখ্যা ৪০ কোটী, অথচ বৎসরে দেড়কোটি লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সেজন্য সেখানে শিশুরক্ষার বিপুল আয়োজন চলিতেছে। স্বাস্থ্যসভা, শিশু সংরক্ষণ সমিতি, স্বাস্থ্য প্রদর্শনী প্রভৃতি অনুষ্ঠান দ্বারা সন্তানবতী জননী সমাজকে এবং কুসংস্কারা-পন্ন গ্রামবাসীদিগকে নানাবিধ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। বলা বাহুল্য তাহাতে ফলও হইতেছে আশাতিরিক্ত।

বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা দেখা গিয়াছে, প্রথম বৎসরেই অনেক শিশু মারা যায়, ইহার মধ্যে সদ্যজাত শিশু মৃত্যুর হার বোধ হয় বেশী, এবং টিটেনাস বা ধনুষ্টঙ্কারই সদ্যজাত শিশুমৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ, কলিকাতার ন্যায় সহরে শিশুযকৃৎ অন্যতম। পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। পল্লীগ্রামে ধনুষ্টঙ্কার ব্যাধির নামান্তর "পেঁচোয় পাওয়া।"

আজকাল বোধ হয় অনেকেই জানেন, কলিকাতার অস্বাস্থ্যকর দুগ্ধই শিশুযকৃতের একমাত্র প্রধান কারণ। এখন আর মাতৃ-স্তন্যরূপ অমৃত অনেক শিশু-ভাগ্যে জুটিয়া উঠে না, বামাগণের স্বাস্থ্য আলোচনা করিবার সময়ে এ সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত বলিব।

গাভীকে যদি উন্মুক্ত ময়দানে চরিতে না দেওয়া যায় সর্ব্বদাই অল্প পরিসর স্থানে বাঁধিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে সে গাভীর দুগ্ধ কখনও সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্যকর হইতে পারে না, 'ফুকো' দেওয়া দুধ শিশুগণের পক্ষে বিষ তুল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, অথচ কলি-কাতায় অধিকাংশ দুগ্ধই এই দোষে দুষ্ট, কলিকাতার ন্যায় স্থানে উন্মুক্ত ময়দানে গোচারণ

অসম্ভব হইলেও শেষোক্ত প্রক্রিয়ার কৃত্রিম উপায়ে দুগ্ধ বহিষ্করণ চেষ্টা করিলে নিবারণ করা যাইতে পারে।

পল্লীগ্রামে অনেকে গাভীপালন করিয়া থাকেন, কিন্তু যাহাদের অপরের উপর নির্ভর করিতে হয় তাহাদের ভাগ্যে খাঁটি জিনিষ মিলে না। কলিকাতার দুধে কলের জল মিশাইলে বোধ হয় স্বাস্থ্যের পক্ষে তত হানি জনক হয় না, কিন্তু পল্লীগ্রামের অনেকেই পচা ডোবা, হাঁদাপুকুর প্রভৃতির সদ্য প্রাণ নাশক ধীজাণুসম্বলিত জল মিশাইয়া দুধকে বিষবৎ করিয়া তুলে, ইহা ভিন্ন দুধের মাখন তুলিয়া অনেকে ময়দা ইত্যাদি নানাবিধ বিক্রয় করে।

"পেঁচোয় পাওয়া" বা পল্লীগ্রামের ভাষায় যাহাদের বলে "পেঁচোপেঁচি", কুসংস্কারাপন্ন পল্লী রমণীদের মতে উপদেবতা বিশেষ। বোধ হয় তাহারা যুগলে অবস্থান করে বলিয়াই তাহাদের নাম পেঁচোপাঁচি, আঁতুড় ঘরের আনাচে কানাচে ওঁৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে, ক্ষণে ক্ষণে শিশু নানাবিধ বর্ণ ধারণ করে ও তাহার কণ্ঠস্বর বিকৃত হইয়া যায়, অভিজ্ঞ পাঠক বিবেচনা করিবার দেখিবেন, এরূপ লক্ষণ সদ্যজাত শিশুর হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়াই হইয়া থাকে, অপিচ সদ্যপ্রসূত শিশুর শ্বাসের ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিলেই তাহার দেহের বর্ণের ও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে শিশুর ধনুষ্টারেও এই সমস্ত লক্ষণ ও কারণ দেখিতে পাওয়া যায় পল্লীগ্রামের আঁতুড় ঘর যে পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা হয়। তাহাতে শিশুদের শ্বাস কষ্ট হইয়া মৃত্যু ঘটিতে বেশী দেরী লাগে না, সাধারণতঃ বাড়ীর মধ্যে যেটি নিকৃষ্ট ঘর, তাহাতে অথবা তাহারই মত বারান্দার আঁতুড় ঘর প্রস্তুত করা হইয়া থাকে—যাহাতে কোনরূপ পেঁচো পাঁচিরা নিশ্বাস পর্য্যন্ত না প্রবেশ করাইতে পারে এরূপভাবে আলোক ও বাতাসের সামান্য পথটুকু রুদ্ধ করিয়াই ঘর খানি প্রস্তুত করা হয়, পরে সপ্তাহ ধরিয়া সেই ঘরে আগুনের কুণ্ড জ্বলিতে থাকে, তাহার গ্যাসটুকু পর্য্যন্ত বহির্গত হইবার উপায় থাকে না, ইহাতেও যে সমস্ত শিশু শ্বাস কষ্টে না মরিয়া বাঁচিয়া উঠে—তাহাদের পরমায়ুর বাহাদুরী আছে বলিতে হইবে।

কুসংস্কাররূপ ব্যাধির শেষ এই স্থানেই নহে। আঁতুড়ঘরে কুমুরিয়া লতা নামক এক প্রকার কাঁটাযুক্ত লতার বের দেওয়া হইয়া থাকে। বেতের কাঁটাও দেওয়া হয়। বন্ধা নামক একপ্রকার গুল্মের ডাল বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে গুজিয়া দেওয়া হয়। কাঁটা দেওয়াতে বোধ হয় আঁচড়ে যাওয়ার ভয়ে অপদেবতা আঁতুড় ঘরে ঢুকিতে সাহস করে না।

এক কড়ি, দু কড়ি, তিনকড়ি, পাঁচকড়ি, ছ'কড়ি, সাতকড়ি ইত্যাদি নামের একটা কৌতুকজনক ইতিহাস আছে, ছেলে জন্মান মাত্র ধাত্রী অথবা মাসী-পিসী ইত্যাদি আত্মীয়ারা মায়ের নিকট হইতে, এক কড়া, দু'কড়া ইত্যাদি কড়ি দিয়া ছেলেকে কিনিয়া লয়, ছেলে তখনই বিক্রীত হইয়া গেল, সুতরাং অপদেবতার সাধ্য কি পরের ছেলেকে লইবেন, অথবা 'উচ্ছিষ্ট' মনে করিয়াও তিনি ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন। 'কড়ির' সংখ্যানুসারেই ছেলের নামকরণ হইয়া থাকে।

'মরাঞ্চে' পোয়াতির ছেলে জন্মান মাত্র তাহার কাণ, মেয়ে হইলে নাক—অথবা শরীরের অন্য কোনস্থান ফুঁড়িয়া দেওয়া হয়। তাহাতে ছেলে খুঁতো হইয়া গেল, এবং খুঁতো ছেলে যমের কোন প্রয়োজনে আইসে না।

কবি বলিয়াছেন—

যে নদী হারা'য়ে স্রোত চলিতে না পারে,
সহস্র শৈবাল দাম বাঁধে আসি তারে।
যে জাতি জীবন হারা অচল অসাড়,
পদে পদে বাঁধে তা'রে জীর্ণ লোকাচার।

কবির উক্তি এই হতভাগ্য জাতির উপর অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হইতেছে। এই জাতি আজ সহস্র শৈবাল দাম পরিবেষ্টিত তটিনীর ন্যায় শক্তিহীন—এই জাতি আজ দর্পচ্যুতা অভিশপ্তা দেববালার ন্যায় দীনা ও মলিনা।

আমাদের দেশে আঁতুড় ঘর অত্যন্ত অপবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়, ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তির অসাধ্য। আমাদের ধাত্রী বিদ্যার অধ্যাপক—বিষ্ণুর সহিত গর্ভস্থ ভ্রূণের তুলনা করিতেন। ভ্রূণের ফুলটি (placenta) বিষ্ণুর নাভি হইতে উত্থিত পদ্মের সহিত তুলিত হইত, দেবদেবীর আগমন পথ অথবা অবস্থান গৃহ সর্ব্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখা হয়, ভ্রূণরূপ বিষ্ণুও ধরাতলে অবতীর্ণ হন বলিয়া তাহার পথটীও প্রাকৃতিক নিয়মে পরিষ্কৃত হইয়া থাকে, অর্থাৎ শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার কিছু পূর্ব্বেই 'পানমুচি' ভাঙ্গিয়া অপত্যপথ আপনা হইতেই পরিষ্কৃত হইয়া যায়। দেবতাদের সহিত যাহার তুলনা হইতে পারে—এরূপ সদ্যঃ প্রসূত শিশুর গৃহটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং পবিত্র জ্ঞান করাই উচিত। অথচ তাহার ঠিক বিপরীতই আমাদের দেশে হইয়া থাকে। কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদ পত্রে অবগত হইয়াছিলাম, পণ্ডিতমণ্ডলী ব্যবস্থা দিয়াছেন, আঁতুড়ঘর অপবিত্র নহে, উহাতে নারায়ণ পূজা পর্য্যন্ত চলিতে পারে। এই ব্যবস্থানুসারে যদি কুসংস্কারাচ্ছন্ন নরনারী তাহাদের আজন্ম সংস্কার দূরে ঠেলিয়া ফেলিতে পারে, তবেই শিশুদের মঙ্গল, নতুবা এই হতভাগ্য দেশে তাহাদের মঙ্গলের আশা দুরাশা মাত্র।

অনেকে হয়ত বলিবেন, এই সমস্ত কুসংস্কারের মধ্যেও তো আমরা মানুষ হইয়া উঠিয়াছি, তখনকার দিনে এখনকার মত এরূপ পরিবর্ত্তনের কিছু দরকার হইত না। তাহার উত্তরে বলা যায়, অনেকে মানুষ হইয়াছেন সত্য, কিন্তু ঐরূপ প্রথার ফলে অকালে যে কত জীব নষ্ট হইয়া গিয়াছে আজকালকার ন্যায়—তাহার খোঁজ খবর সেকালে কেহই রাখিতেন না।

নাড়ী কাটার দোষে নাড়ীর প্রদাহ হইয়া ও ঠাণ্ডা লাগিয়া এবং অন্যান্য কতকগুলি কারণেও শিশুর ধনুষ্টঙ্কার রোগ জন্মিয়া থাকে। এই রোগে শরীরটী আড়ষ্ট হইয়া ধনুকের ন্যায় বক্র হইয়া যায় এবং শিশু স্তন্যপান করিতে পারে না। 'পেঁচোয় পাওয়ার' ইহাই সর্ব্বপ্রথম লক্ষণ। শুনিতে পাওয়া যায়, ওঝারা পেঁচোয় পাওয়া শিশুদের হাতে কাটি দিয়া তাহাদিগকে হাঁটাইয়া থাকে, ইহাতেও তাহাদের বাহাদুরী বিশেষ কিছু আছে বলিয়া বোধ হয় না। ধনুষ্টঙ্কারগ্রস্ত

আড়ষ্ট শিশুর হাতে কাটি দিয়া তাহাকে যে কেহ হাঁটাইতে পারে। তপ্ত তৈলপূর্ণ কটাহে শিশুকে নিক্ষেপ করিয়া বায়স বেঙ ইত্যাদি জন্তুতে পরিণত করার গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। সদ্যজাত শিশুকে কিছু সময় ধরিয়া ঐরূপ করিলে তাহারা কিরূপ আকার ধারণ করিতে পারে তাহা সুধীগণ একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের গ্রামে একটী পৈশাচিক ঘটনা ঘটে বলিয়া শুনিতে পাই। সে কথা স্মরণ করিতে আজও সর্ব্বশরীর আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, একটী নিম্ন শ্রেণীর গৃহে এক সদ্যজাত শিশুর ধনুষ্টঙ্কার হয়। ফকির আসিয়া মত দিয়া গেল,—"ইহার ভিতরের সারপদার্থ অর্থাৎ জীবন অনেক ক্ষণ হইল পেঁচোপাচিতে লইয়া গিয়াছে, ফিরাইবার আর কোন উপায় নাই, এখন যাহা দেখিতেছ, সে অপদেবতার লীলা মাত্র। ইহাকে এখন ফেলিয়া দিতে পার, কিন্তু লাথি মারিতে মারিতে লইয়া যাইতে হইবে, অপদেবতাকে তো জব্দ করা চাই!" গৃহস্বামীত সেই হতভাগ্য শিশুটীকে ফুট বলের ন্যায় কিক্ (Kick) করিতে করিতে লইয়া গেল! হায় বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য শিশুরা!—হায় তাহাদের দুর্ভাগ্য পিতৃমাতৃগণ? এই সমস্ত রোমহর্ষণ পৈশাচিক অনুষ্ঠানের ফলভোগ আর তাহার কতদিন করিবে?

(ক্রমশঃ)

হিতকথা।

[শ্রী ক্ষীরোদ লাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ]

—— •:•:• ——

গৃহের লক্ষ্মী বঙ্গনারীকে রায়বাঘিনী করোনা,
পরাধীন এই দুঃস্থ জাতির গৃহ-সুখটি ঘুচিও না।
রোগে শোকে দাসত্বে তা'র পরাণ ওষ্ঠাগত প্রায়;
শ্রান্ত পান্থসম জুড়াক (এসে) ঠাণ্ডাগৃহ বটতলায়।
ভাঙ্গা সহজ,গড়া কঠিন—এই কথাটী ভুলোনা;
পরের দেখে ধাঁ ক'রে ভাই নিজের ভাল ছেড়োনা।
জাতি ধর্ম্ম বজায় রেখে সবাই বেড়ে উঠেছে;
আম কখনো হয়নি কাঁঠাল—কাক কি ময়ূর হ'য়েছে?
নারী শিক্ষা ভাল বটে, স্বাতন্ত্র্যে তা'র নাই কল্যাণ—
বিধাতার এই শুভ বিধান—নরের পাশে নারীর স্থান।
স্বাস্থ্য, সেবা, ধর্ম্ম, নীতি, কুটীর শিল্প শিক্ষা দাও;

সতী সহধর্ম্মিনীকে সহযোগিনী গড়ে' নাও।
সবাই যদি বাহিরে গিয়ে মাঠে ঘাটে হাওয়া খায়,
রান্না বাড়া গৃহস্থালী—শিশু পালন হ'বে দায়।

স্ত্রীকে স্বাধীন কর্‌তে তোমরা
নাছোড়বন্দা দেখ্‌ছি ভাই,
(কিন্তু) লক্ষ লক্ষ পল্লী ম'র্‌ছে—
সেদিকে মোটেই দৃষ্টি নাই।
ঘৃত সর ক্ষীর ছানা ননী দই
মাখন গোরস শূন্য দেশ :—
গোপালন ভুলি, কুকুর পুষিলে,
মোক্ষ তোমার মাথার কেশ।
ব্যসন-বিলাসে গাত্র ঢালিয়া
সাবান মাখিয়া খাইছ ছাই ;
ভেজাল ময়দা ঘৃত তেল চিনি,—
বিশুদ্ধ খাদ্য দেশেতে নাই।
রোগের জালায় পাগল হইয়া
কত যে ওষুধ দু'বেলা খাও,
তথাপি আহার বিহারে সংযম
শুচিতার দিকে মন না দাও।
(আর) বেশী বলিবনা, মিঠেকড়া ভাল,
তিক্ত হইলে গিলেনা কেহ ;—
দেশের অবস্থা জানিতে হইলে
যুবকের দেখ জীর্ণ দেহ।

সব ব্যাপারে মুক্ত স্বাধীন নারী যদি হ'তে চায়,
স্নেহ-সুধা মাখি' কে গো ক্ষুধার অন্ন দিবে বা হায়!!
বহুমূত্রী অম্লশূলী খেটে অস্থি চর্ম্ম সার,
ম্রিয়মাণ এই জাতিটাকে মা বিনে কে বাঁচাবে আর!!
হ'লে শুচি পিতা মাতা জ্ঞান শক্তি পুণ্যময়,
কার্ত্তিক গণেশ জন্মিবে রে পুনঃ দেশে সুনিশ্চয়।

মায়ের মত মা হবে রে যদি দেশে ভাল চাও ;—
সখের নারী কাচের পুতুল 'তাকে' তুলে ঘর সাজাও।
জাতিটা আগে রক্ষা কর—পল্লীগুলো বাঁচিয়ে দাও,
স্বাস্থ্যনীতি খাদ্যতত্ত্বে কোমর বেঁধে লেগে যাও।
জোর কলমে লেখা লিখি চল্‌ছে যেরূপ দেশটাময়,
রান্না ঘরে আঁতুড় ঘরেও মোদের বুঝি ঢুক্‌তে হয়!
এখনো তো অনেক গৃহে পাচক ঠাকুর আসেনি,
মা সকলই কষ্টে সৃষ্টে ঝোল ভাতটা রাঁধেনই।
স্বাস্থ্যহীন এই 'মোরো' জাতির ভেজাল নোংরা খাদ্য খেয়ে
অম্ল শূল আর বুক জ্বালা যে, সারা দেশটা ফে'ল্‌ল ছেয়ে!
যে দিন হ'তে বঙ্গনারী পরের হাতে রান্নাঘর
সঁপে দিয়ে কলম নিয়ে ব'সে গেলেন চেয়ার, পর,
সেই দিন হ'তে স্বামীপুত্রের ডিস্‌পেপসিয়া লেগেছে—
পরের জন্য প্রাণের দরদ দিয়ে কি কেউ রেঁধেছে?

মার্জ্জিতরুচি জ্ঞান বিজ্ঞান
সভ্যতালোকে ব্যভিচার,
উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতা আর
স্বেচ্ছাচারিতা—পানাহার ;
নভেলি প্রণয় বাজারে পিরীত
হোটেলি মিলন উপহার,
উৎকট আদব কায়দা কানুন
কপট-দোকানি-শিষ্টাচার ;

পাপের স্রোতে পবিত্রতা
ভেসে গেছে অনেক দিন,
পচা, খিচুড়ি একাকার
এলোমেলো সংযম হীন।
সমাজ যদি আদর্শ হয়,
ক্ষতি বৃদ্ধি নাই আমার ;—

প্রেমানন্দ শান্তি জ্ঞান
উন্নতিটি চাই গো আর ;
হ'লেই বাঁচি—হর্ষে বিষাদ,
শিব গ'ড়্তে বানর না হয়,
জ্ঞান অজ্ঞান, আলোয় আঁধার—
এই শুধু মোর আছে ভয়।

উড়ুম্বর।

(রিপোর্টারের পত্র)

(পূর্ব্বানুবর্ত্তী)

—:০:—

১। শ্বাপদ বিষের মহৌষধ

উড়ুম্বর পত্রের সার সেবনে কুকুর শিয়াল দংশন জনিত বিষ নষ্ট হইয়া দ্রংষ্ট ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা হয়। হাজার হাজার রোগীর মধ্যে ২।১টী রোগীর বেলায় ইহা ব্যর্থ হইতে পারে।

২। বিষধর সর্প বিষের মহৌষধ।

সর্ব্বপ্রকার সর্পদংশন জনিত মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে ইহা অব্যর্থ মহৌষধ।

আমি বহুবিধ বনস্পতি ও উদ্ভিদের সার নিষ্কাশন করিয়াছি এবং ভিন্ন ভিন্ন রোগে—প্রয়োগ করিয়া যে প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিয়াছি তন্মধ্যে উড়ুম্বরের (যজ্ঞ ডুমুরের) সার অমোঘ ও অব্যর্থ। আমার এই বিশ্বাস আছে, উড়ুম্বর সার হাজার হাজার রোগীকে ব্যবহার করাইলে একটীতেও ব্যর্থ হইবেনা। অতঃপর আমি এই সারের গুণ বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইব।

এই উড়ুম্বর সার শস্ত্রাঘাত জনিত সর্ব্ববিধ রক্তস্রাব বন্ধ করিয়া জ্বালা যন্ত্রণা দূর করিবার জন্য অব্যর্থ ঔষধ। সংক্ষেপতঃ ইহা সক্ষত ও অক্ষত অভিঘাতের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। নূতন ও সাধারণ ব্রণ (ফোঁড়া) উঠিবার পূর্ব্বে ও পরে সমস্ত অবস্থায় ইহার প্রয়োগে অন্যান্য যাবতীয় ঔষধ অপেক্ষা বিশেষ কার্য্যকরী হয়। ফোড়া উঠিবার সময় যদি সার প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে জ্বালা যন্ত্রণা ও শোথ (ফুলা) দূর হইয়া ফোড়া বসিয়া যায়। ফোড়া পাকাইবার জন্য ও এই সার ব্যবহার করিলে ফোড়া পাকিয়া আপনি ফাটিয়া যায়। অস্ত্রোপচারের (operation) পর এই সার ব্রণের ভিতর প্রয়োগ করিলে Idnoform carbolie lotion প্রভৃতি প্রতিষেধক ঔষধের কাজ করে। যে সকল ডাক্তারী ঔষধে ক্ষত শুকাইতে ও ব্রণের পূরণ করিতে ৭।৮ দিন সময়

লাগে, সেক্ষেত্রে এই সার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নালী ঘা প্রভৃতির আশঙ্কা সম্পূর্ণ দূর করিয়া ক্ষত শুকাইয়া দেয় ও ব্রণ পূরণ করিয়া দেয়। ইহা রক্ত শোধক ও ব্রণ শোধক। চক্রব্রণে ও নাড়ী ব্রণে ইহার বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন সাংঘাতিক ক্ষত স্থানে কীট উৎপন্ন হইলেও এই সারের প্রয়োগে ঐসকল কীট মরিয়া যায় ও ক্ষত ক্রমে শুকাইয়া যায়। ভগন্দর প্রভৃতি দুশ্চিকিৎস্য রোগে ইহার প্রয়োগে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে। দুষ্ট প্রাণহারী জীবাণুর ধ্বংস সাধন করিতে এই সার অব্যর্থ।

আমার ঔষধালয়ের ম্যানেজার চণ্ডীচরণ শর্ম্মার অঙ্গুলীতে একপ্রকার ব্রণ হইয়াছিল। অস্ত্রোপচারের পর বৃশ্চিক দংশনবৎ অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি ঔষধালয়ের প্রাঙ্গনে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছিলেন তৎপর আমি উড়ুম্বরের পত্রের প্রলেপ দিয়া তাঁহাকে আরোগ্য করিয়াছিলাম। এরূপ বহুবিধ অবস্থায় উড়ুম্বর পত্রের প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

দদ্রুরোগে, পামা বিচর্চ্চিকা নেত্রাভিষ্যন্দে, যাবতীয় মুখরোগে, জিহ্বা ও দন্তাঘাতে, দন্তমূলে ঘা হইলে, গ্রীবাদেশে শোথ হইলে, কর্ণ রোগে, নাসিকা রোগে, চক্ষুর যাবতীয় জ্বালা যন্ত্রণায়, শ্লীপদ প্রভৃতি রোগে ইহার ফল প্রত্যক্ষ গোচর হইয়াছে। ইহা ছাড়া কণ্ঠ রোগ (গ্রন্থি উদ্ভূত হইয়াছে অথচ পাকে নাই), গ্রহণী, মন্দাগ্নি, অতিসার, গণোরিয়া, সিফিলিস, রক্তপিত্ত, অসৃগ্, প্রদর, প্রমেহ প্রভৃতিরোগে ইহা সেবনে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। অশ্বাদি পশুর দন্তাঘাতে যন্ত্রণা হইলে এই সারের ব্যবহারে উহা দূর হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি একবার টম্‌টম্ গাড়ী হইতে পতিত হইয়া বিশেষ কষ্ট পাইতেছিলাম ; আমার সমস্ত অঙ্গে অসহ্য বেদনা—এমন কি কোন কোন স্থানে ক্ষত হইয়াছিল। এই উড়ুম্বর পত্র ব্যবহারে আমি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছিলাম। একজন রাজমিস্ত্রী আমার বাড়ীতে দেওয়ালের উপরে কাজ করিতেছিল ; সে হঠাৎ ঐরূপ উচ্চস্থান হইতে ভূমিতে পতিত হইয়া সাংঘাতিক রূপে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাকেও এই সার ব্যবহার করাইয়া উহার অত্যাশ্চর্য্য ফল আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। পদতল ফাটিয়া গেলে এই সার প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তির ক্ষত ইত্যাদি দূরীকরণার্থ এই সার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

আমার আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের একবার রান্না করিবার সময় ডালের ভাণ্ড হইতে উত্তপ্ত ডাল পায়ে পড়িয়া অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণা হয়, ঐ সময়ও আমি এই সারের অদ্ভুত ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিছুদিন পূর্ব্বে আমার জানুদেশে অসহ্য বেদনা হয়, বহু ঔষধ প্রয়োগ করিয়া নানাপ্রকার তৈল মর্দ্দন করিয়াও কোন ফল পাই নাই ; অবশেষে Electric Bettery প্রয়োগ করিয়াছিলাম—তাহাতেও কোন ফল হয় নাই। আমি তখন জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। সৌভাগ্যের বিষয় এই উড়ুম্বর পত্রের প্রলেপ দেওয়ায় ঐ স্থানের দূষিত রক্ত সংস্কৃত হওয়ার পর

সমুদয় যন্ত্রণা দূরীভূত হইয়াছিল। একপ্রকার বায়ু বিকারেও ইহার ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া উড়ুম্বরের অত্যাশ্চর্য্যগুণ আপনাদের নিকট সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। এই ঔষধ সর্ব্বত্র সুলভ ও ভূমণ্ডলে অদ্বিতীয়। আপনারা ইহা ব্যবহার করিয়া যদি ফল পান, তাহা হইলে আমার আবিষ্কার সার্থক হইবে।

অতঃপর পণ্ডিত মহাশয়ের বক্তৃতা শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় তাঁহার হিন্দী বক্তৃতা সংক্ষেপে বঙ্গভাষায় বুঝাইয়া দিয়া তৎপ্রসঙ্গে বলিলেন—"এই মহাত্মার একটা বিশেষত্ব এই, তিনি অর্থের বিনিময়ে চিকিৎসা করেন না। স্বীয় পারিশ্রমিক লওয়া দূরের কথা, ঔষধের মূল্য পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না। এজন্য বহু ক্ষেত্রে তিনি এই ঔষধ প্রয়োগের সুবিধা পাইয়া উহার গুণ প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। পণ্ডিত মহাশয়ের নিঃস্বার্থ পরতাগুণে তিনি ভারতবর্ষে চিকিৎসক সমাজে বরেণ্য হইয়াছেন।

নাত্মার্থং নাপি কামার্থং অত ভূতদয়াং প্রতি
বর্ত্ততে যশ্চিকিৎসায়াং স সর্ব্বমতি বর্ত্ততে।

অর্থ বিনিময়ে চিকিৎসা না করিয়া রোগার্ত্ত জনের দুঃখ অপনোদন করিয়া তিনি যথার্থ চিকিৎসক চূড়ামণি হইয়াছেন। আর আমরা অর্থের বিনিময়ে চিকিৎসা করিয়া পারমার্থিক অমূল্য কাঞ্চন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধূলিরাশি গ্রহণ করিতেছি, যথা—

'কুর্ব্বতে যে তু বৃত্ত্যর্থং চিকিৎসা পণ্য
বিক্রয়ং।
তে হিত্বা কাঞ্চনং রাশিং পাংশু রাশি
মুপাসতে।

পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট আমি পূর্ব্বেই যজ্ঞ ডুমুরের সারের গুণাবলী শ্রবণ করিয়াছি এবং পরীক্ষার্থ অনেক স্থলে প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফলও পাইয়াছি। আমার নিজের বাড়ীতে আমার স্ত্রীর একবার চক্ষুর অভ্যন্তরে আঘাত লাগিয়া জ্বালা-যন্ত্রণা হয়; চক্ষু লাল হইয়া ফুলিয়া উঠে। ডাক্তারী ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কোন ফল না পাওয়ায় এই উড়ুম্বর সার প্রয়োগ করিয়া অত্যাশ্চর্য্য ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি। পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট আমার নিবেদন এই যে, তিনি ভবিষ্যতে আরও নূতন নূতন ঔষধ আবিষ্কার করিয়া আয়ুর্ব্বেদের লুপ্ত বিদ্যার উদ্ধার করিবেন। আমি সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।" সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিলে কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যাপক কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কাব্যতীর্থ মহাশয় নাতি দীর্ঘ সংস্কৃত ভাষায় উক্ত আবিষ্কারের জন্য পণ্ডিত মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তৎপরে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ শ্রীযুত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম এ এম বি মহাশয় বলিলেন—"পণ্ডিত শ্রীযুত চন্দ্রশেখর ধর মিশ্র মহাশয়ের সহিত ইতিপূর্ব্বে সভাপতি মহাশয়ের বাড়ীতে আমার পরিচয় হইয়াছিল। সেই সময় তাঁহার নিকট যজ্ঞডমুরের গুণের কথা শ্রবণ করিয়া আমি বহুস্থলে উহা প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইতিপূর্ব্বে আমরা এই যজ্ঞ ডুমুর একমাত্র অনুপান ও সহপান হিসাবে প্রয়োগ করিতাম, কিন্তু এই যজ্ঞডমুরের সারের মধ্যে যে এরূপ অসাধারণ শক্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহা কোন দিন

কল্পনাতেও আনিতে পারি নাই। পণ্ডিত মহাশয়ের আবিষ্কারের ফলে ইহা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। আরও কত শত বনৌষধির মধ্যে এরূপ বহু রোগনাশক শক্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহা কে জানে? যদি সর্ব্ব চিকিৎসা বিদ্যার প্রসূতি আমাদের বৈদ্যক্-বিদ্যার লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক চিকিৎসকের কর্ত্তব্য এই বৈদ্যকুলনায়ক পণ্ডিত মহাশয়কে আদর্শ করিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পন্থানুসরণ পূর্ব্বক বনৌষধি সমূহের গুণাবলীর উদ্ভাবনার চেষ্টা করা। তাহার পর তিনি পণ্ডিত মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভাপতি মহাশয়ের আদেশে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি-এ।

বহুমূত্রের নব বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা।

[ডাক্তার মৈত্র]

চিকিৎসা জগতে আজকাল বহুমূত্র রোগের যে নব চিকিৎসা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়া আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে যতটুকু সঠিকভাবে জানিতে পারিয়াছি,—এখানে তাহারই অবতারণা করিব। ইহা "Insulin treatment" of Diabetes নামে পরিচিত এবং পেন্সিলভেনিয়া ও অন্যান্য আমেরিক্যান ইউনিভার্সিটির মেডিকেল ফেকাল্টি কর্ত্তৃক সাদরে অনুমোদিত হইয়াছে।

কথিত চিকিৎসা প্রথার প্রবর্ত্তক হইতেছেন Dr. F. C. Banting এবং তাঁহার সঙ্গী Dr. C. H. Best। উভয়েই টরেণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট। বর্ত্তমান সনের বিগত জানুয়ারী মাস হইতে এই প্রথার চিকিৎসা অনেক ডায়বেটিস বা বহুমূত্র রোগীর উপর পরীক্ষিত হইয়া আসিতেছে। Torrento জেনারল হাঁসপাতালে কয়েকটী সৈনিক ও গৃহস্থ ভদ্রলোকের উপর এই পরীক্ষা চলিয়াছিল, এই সকল চিকিৎসিত রোগীর মধ্যে কয়েক জনের পীড়ার অবস্থা খুব বৃদ্ধিই পাইয়াছিল। Torrento বিশ্ববিদ্যালয়স্থ ফিজিয়লজী বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ S, J. R. Macleod বলেন, এই চিকিৎসায় কাহারও মৃত্যু হইতে দেখা যায় নাই এবং যাহারা ইহার প্রভাব দ্বারা চিকিৎসিত হইতে আসিয়াছিল, তাহারা সর্ব্ববিধ প্রকারে স্বাস্থ্যে উন্নতিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল—(যথায় প্রকৃত ফিজিওলজীক এক্স্ট্রাক্ট সন্তোষজনক ভাবে পাওয়া গিয়াছিল)।

বহুমূত্র পীড়ায় উহা প্রকৃত আরোগ্যকারী চিকিৎসা কিনা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন—"এখনও ইহাকে ডায়াবিটিসের আরোগ্যকারী চিকিৎসা ঠিক বলিতে পারা যায় না। তবে থাইরইড গ্ল্যাণ্ডের পীড়াদিতে থাইরইড এক্‌ষ্ট্রাক্ট যেরূপ কার্য্যকরী, ইহাও সেইরূপ জানিবে। যে পর্য্যন্ত ইহার প্রয়োগের ব্যবহার

* এ প্রবন্ধের লিখিত বিষয়ের সহিত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় সম্বন্ধ না থাকিলেও ইহা একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তারের লেখা বলিয়া ইহা আমরা প্রকাশ করিলাম।—আং সং।

চলিবে, ততদিনই উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইবে"। পরে ইহা প্রকৃত কার্য্যকরী হইতে পারিবে কি না তাহা এখনও পরীক্ষায় সম্পূর্ণ স্থিরীকৃত হয় নাই। তবে আশা আছে যে, ভবিষ্যতে উহা ফলপ্রদ বলিয়া স্থিরীকৃত হইতে পারে। ম্যাক্লাউড বলেন, ইহাকে ঠিক "সিরাম চিকিৎসা" বলা যাইতে পারে না, কারণ যে পদার্থটি এই চিকিৎসায় ব্যবহার করা যাইতেছে, তাহাকে এক্ষ্ট্রাক্ট বা সার পদার্থ মাত্র বলা যাইতে পারে (সিরাম নহে), মাত্র চর্ম্ম নিম্নে Subcutaneously হাইপো-ডার্ম্মিক ইন্‌জেক্‌শনরূপে প্রয়োগের ব্যবহার সিরাম চিকিৎসার সহ প্রয়োগ আছে জানিবে।

কথিত সার পদার্থটি "ইন্‌সুলিন" নামে পরিচিত, উহা প্যান্‌ক্রিয়াসের—আইল্যাণ্ড টিস্যু হইতে সংগৃহীত, এই জন্যই উক্ত চিকিৎসা-প্রণালী "ইন্‌সুলার চিকিৎসা" আখ্যায় প্রচলিত হইয়াছে জানিবে। কিন্তু কথিত ইন্‌সুলিন্‌ পদার্থটি is not a substance which can be separated and to be had pure in fact বিশুদ্ধভাবে পাওয়া বড়ই সুকঠিন—যেহেতু উহার সহিত প্রায়ই অন্যান্য ক্ষরণাদি বিমিশ্রিত অবস্থায় থাকিয়া যায়। প্রকৃতিতে ইহা একটি fermant ফারমেণ্ট বিশেষ। ইহার: ফিজিওলজীক্যাল strength শক্তি বলিতে বুঝিতে হইবে যে, পরিমিত মাত্রায় বিশুদ্ধ বা অবিমিশ্রিত উক্ত পদার্থ উহার কথিত সার পদার্থ মধ্যে বিদ্যমান আছে।

কথিত পদার্থ প্রয়োগে প্রকৃত আরোগ্য হইতে দেখা না যাইলেও উহার ব্যবহার কালে বিশেষ উপকার যে লক্ষিত হইয়াছে তাহাতে আর সংশয় মাত্র নাই। ডায়াবিটিস পীড়ায় বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে শারীর বিধানে শর্করা বা চিনি পদার্থের সমীকরণ বা অক্‌সিডাইজ oxdise করিবার অক্ষমতা আনাইয়া দেয়, সুতরাং শর্করা এবং ষ্টার্চ্চ starch বা শ্বেতসার পদার্থাদি সমন্বিত খাদ্য দ্রব্যাদি আর আহার করা চলে না।

ডায়াবিটিসের তীব্রতার নানারূপ প্রতিমূর্ত্তি চিকিৎসা পুস্তকে বর্ণিত থাকিলেও অভিধান দৃষ্টে ইহার মেলিটাস বা সশর্কর বহুমূত্রই সাধারণতঃ fatal বিষম বলিয়া স্বীকৃত হয়। ক্যান্সার বা টুবারকুলোসিসের ন্যায় ইহা অতি মাত্রায় পাশ্চাত্য জগতে দৃষ্ট না হইলেও উহার বিদ্যমানতা নিতান্ত স্বল্প ও নহে—একমাত্র টরেণ্টো সহরে ৬০০,০০০ বাসিন্দা মধ্যে ৫০০০ ব্যক্তিতে ইহা দৃষ্ট হইয়াছে।

অধুনা ডায়াবিটিসের চিকিৎসায় প্রধানতঃ পথ্যাদির উপরই জোর দেওয়া হইয়া থাকে। মৃদু আক্রান্তির স্থলে এতাদৃশ পথ্য বিচারে সুফলও পাওয়া যায়, কিন্তু কঠিন স্থলে মাত্র উহার উপরে যে নির্ভর করা যাইতেই পারে না—তাহা ব্যাণ্টিং সাহেব বলেন। এতাদৃশ উপায়ে পথ্য-বিচার দ্বারা কোন কোন রোগীতে আহারের মাত্রা প্রত্যহ ১০০০ ক্যালরীতে calory দাঁড়াইয়া যায়, কিন্তু স্বভাবতঃ মনুষ্যের খাদ্য পরিমাণ নিত্য ২০০০-২৫০০ ক্যালরী হওয়া আবশ্যক বলিয়া জানা গিয়াছে। সুতরাং এই হিসাবে বুঝিতে পারা যায় যে, কথিত প্রকারের পথ্য বিচারে নির্ভরীকৃত রোগীগণ প্রায় নিরাহারের সীমানায় তখন আসিয়া পৌছিয়াছিলেন।

ইন্সুলিন ইন্জেক্শন চলিতে থাকার সময়ে কিন্তু কথিত রোগীগণকে স্বাভাবিক মাত্রায় আহার্য্য পদার্থাদি খাইতে দেওয়া হয়। একটি রোগী এতৎ চিকিৎসার সময় প্রায় ১১ গুণ অধিক শর্করা পদার্থ খাইয়াছিল—অথচ তৎফলে কোন প্রকার মন্দফল উদ্ভূত হইতে দেখা যায় নাই (পূর্ব্বে শর্করাজাত কোন পদার্থ বা শর্করা এত অধিক মাত্রায় খাইলে আদৌ সহ্য হইত না)।

১৯২০ সালে একদিন সন্ধ্যার সময় Iles of Laugurans নামক প্রবন্ধ পাঠকালে কথিত চিকিৎসা প্রণালী ব্যান্টিং সাহেবের মনে ইঙ্গিতভাবে উদিত হইয়াছিল। ল্যাঙ্গারবান্স নামক এক জন জার্ম্মাণ পণ্ডিত 'আইল্স অব ল্যাঙ্গারবান্স' নাম দিয়া প্যান্ক্রিয়াসের (ক্লোম যন্ত্র) একটি অংশ বিশেষকে পরিচিত করিয়াছেন। কথিত উক্ত স্থান হইতেই শরীরস্থ রক্ত মধ্যে দেহস্থ শর্করার অক্সিজেশন জন্য আবশ্যকীয় তরল পদার্থ নিঃসৃত হইয়া থাকার কথা তিনি বলেন। এতাদৃশ নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদনে অপারগ হইলেই—ডায়াবিটিস বা বহুমূত্র (সশর্কর) পীড়া দেখা দেয় বলিয়া তাঁহাদের ধারণা।

প্যান্ক্রিয়াসের কিন্তু আরও একটি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে জানিবে। অন্ত্রমধ্যে অন্য একটি দ্বিতীয় তরল পদার্থের নিঃসরণ দ্বারা পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য ইহাতে হইয়া থাকে। ব্যান্টিং সাহেব স্থির করিলেন যে, যদি কোন প্রাণীর দেহে অন্ত্রের সহিত প্যান্ক্রিয়াসের সংযোগ প্রণালী বা ডাক্টের duct প্রতিরোধ দ্বারা কোন প্রকারে উভয়ের মধ্যস্থ চলাচল ক্রিয়া স্থগিত করিতে পারা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে প্যান্ক্রিয়া যন্ত্রটির সম্পাদনীয় একটি কার্য্যে বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় অন্যটির ক্রিয়ার উত্তেজনা পাইতে পারে অর্থাৎ শর্করা অক্সিডাইজ করিবার কার্য্যটি বৃদ্ধি পাইতে পারে। এই প্রকারে কথিত সমধিক উত্তেজনা প্রাপ্তির ফলে ক্ষরিত পদার্থের surplus প্রয়োজনাতিরিক্ত অংশ সংগ্রহ করিতে পারা সম্ভবপর হইলে উহার সার পদার্থ extract লইয়া ডায়াবিটিস বা বহুমূত্রাক্রান্ত রোগীর শরীরে ইন্জেক্ট করিলে নিশ্চয়ই তৎ প্রভাবে দেহস্থ শর্করা অক্সিডাইজ্ড হইয়া রোগীকে উপশম প্রদান করিতে সক্ষম হইবে।

প্রথমে কুকুরের উপর ইহার ব্যবহারিক পরীক্ষা লওয়া যায়। কুকুরের প্যান্ক্রিয়াস হইতে এক্ষ্ট্রাক্ট বাহির করিয়া ডায়াবিটিক কুকুরের উপর উহার প্রয়োগ করা হয়। ডায়াবিটিক কুকুর বলিতে এই বুঝায় যে, তাহার শরীর হইতে প্যান্ক্রিয়াসটি কাটিয়া বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে (ডায়াবিটিস রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে এতদর্থ সকলেই অবগত আছেন)। এতাদৃশ প্যান্ক্রিয়াস শূন্য কুকুর মাত্র ১৪ দিন জীবন ধারণ করিতে পারে। কিন্তু উহার শরীরে ইন্সুলার চিকিৎসা করার পর (১৯২০ সালের মে মাসে) কথিত কুকুরটি ৭০ দিবস পর্য্যন্ত বাঁচিয়াছিল দেখা গিয়াছে।

তাহার পর বিগত ডিসেম্বর মাসে মনুষ্য শরীরে কথিত পদার্থ ইন্জেক্ট করায় বিষময় ফল উদ্ভূত হইতে পারে কিনা তাহা দেখিবার জন্য উভয়েই ব্যাকুল হইয়া পড়েন। কিন্তু

সাহস করিয়া অন্ত কাহারও উপর পরীক্ষা গ্রহণ করিতে প্রাণ চাহে নাই! পরিশেষে ব্যাণ্টিং নিজ দেহে উহা প্রবেশ করাইয়া পরীক্ষা করিতে সম্মত হয়েন এবং প্রথম ইঞ্জেক্সন্ ডাক্তার বেষ্ট তাঁহার শরীরে প্রয়োগ করেন। ব্যাণ্টিং তৎপরে ডাক্তার বেষ্টের শরীরেও কথিত ইন্‌সুলিন ইনজেক্ট করিয়া দিলেন। এই পরীক্ষার সময়ে একটী ষাঁড়ের ox প্যাঙ্ক্রিয়াস হইতে একস্‌ট্রাক্ট লওয়া হইয়াছিল।

বিগত জানুয়ারী মাসে বহুমূত্র দ্বারা পীড়াগ্রস্থ কয়েকটী মনুষ্যের উপর এই চিকিৎসা আরম্ভ হইয়াছিল। তাহাতে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, বিখ্যাত ক্যানাডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন জার্ণাল তাহা নিম্নলিখিত প্রকারে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন :—

(১) রক্তের মধ্যস্থ শর্করার অংশকে স্বাভাবিক মাত্রায় আনিতে পারা সম্ভব।

(২) মুত্রের মধ্য হইতে শর্করা চিহ্ন বিলোপ করা যাইতে পারে।

(৩) মূত্র হইতে "য়্যাসিটোন" পদার্থের বিদূরণ করা যাইতে পারে।

(৪) শ্বাস প্রশ্বাসে কার্ব্বো হাইড্রেটের ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ব্যবহারের চিহ্ন লক্ষিত হয়; রোগীর সাধারণ স্বাস্থ্য বিশেষ প্রকারে লক্ষিত ভাবে উন্নত হইতে দেখা গিয়াছে।

বর্ত্তমানে এই চিকিৎসা প্রণালীতে প্রতি দিবস দুই একবার করিয়া হাইপোডার্ম্মিক ইঞ্জেক্সন্ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে; একশত ইঞ্জেক্সন লইয়াও ডায়াবিটিক রোগীগণ এতৎ প্রভাব জনিত কোন প্রকার মন্দ ফল উৎপন্ন হইতে দেখেন নাই। যেহেতু এই চিকিৎসা-প্রণালীতে খাদ্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ বাধা নিষেধ না থাকায় রোগীগণের শরীরগত পরিপোষণের কোনই অভাব লক্ষিত হয় নাই; অথচ শরীরস্থ লুপ্ত শক্তি ক্রমশঃ ফিরিয়া পাইতে থাকায় দৈহিক কার্য্য প্রণালী নিয়মিত ভাবে চলিয়া ক্রমশঃ পীড়াটীকে অদূর ভবিষ্যতে আরোগ্য করিবারই সহায়তা করিয়া থাকে।

ডাক্তার ব্যাণ্টিং বলেন, কথিত ইন্‌সুলিন পদার্থ টী সংগ্রহ করিবার সঠিক উপায় স্থিরীকৃত হইলে টরেণ্টো ইউনিভারসিটির মেডিক্যাল বিভাগের সাহায্যে যাহাতে উহা সর্ব্ব সাধারণের পক্ষে সহজেই প্রাপ্য হইয়া জগতে ডায়াবিটিস্ রোগগ্রস্থের প্রকৃত কল্যাণপ্রদ ভেষজরূপে পরিগণিত হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তিনি উহার পেটেণ্ট স্বত্ব এবং তাহা হইতে প্রভূত অর্থ লাভের আশা সমুদয়ই ত্যাগ করিবেন।

মন্তব্য ঃ—নব বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা নামে ডায়াবিটিসের যে বিষয়টীর বর্ণনা প্রবন্ধান্তর হইতে উপরে অনুদিত করা হইল, তাহা বর্ত্তমান প্রচলিত এলোপ্যাথির এণ্ডোক্রাইনস্ ভেষজাদিরই অন্তর্গত। বহুবিধ রাসায়নিক পদার্থাদির একত্র সংমিশ্রনে নানা প্রকারের বিকট এবং উৎকট নামধারী ভেষজ পদার্থাদি ব্যবহারে কোন একটী রোগ দূরীকরণের নামে নূতন ১০টী রোগের সৃষ্টি হইতে দেখিয়া সুধীর ও ধীমান প্রকৃত রাসায়নিক চিকিৎসকবৃন্দ ক্রমাগত পরীক্ষা করিয়া বর্ত্তমান সময়ে এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন যে, দেহীগণ যখন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে তখনই তাহার শরীরস্থ গ্ল্যাণ্ড সমুদয়ের ক্ষরণ কার্য্য বিকৃত, বাধাযুক্ত অথবা স্বাভাবিক অপেক্ষা মাত্রায় বৃদ্ধিভাব বা স্বল্পতা প্রাপ্ত হয়।

দেহ মধ্যে ছোট বড় আকারের অসংখ্য গ্ল্যাণ্ড বিদ্যমান আছে। উহাদের মধ্যে প্রধানতম কয়েকটীর কার্য্য মাত্র ফিজিলজী শাস্ত্রপাঠে আমরা জানিতে পারিয়াছি। বিজ্ঞান যতই কেন উন্নত না হউক, দেহ মধ্যে পূর্ব্ব কথিত অসংখ্য গ্ল্যাণ্ডাদির অস্তিত্ব রাখায় সেই বিশ্বস্রষ্টার যে কি উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে, আজিও তাহা মানবের ক্ষুদ্র বুদ্ধির গোচরীভূত হয় নাই। কথিত গ্ল্যাণ্ড আদির আভ্যন্তরীক পৃথক ও সমবায় ক্ষরণ দ্বারা দেহীগণের আভ্যন্তরিক ক্ষয়াবস্থা যে পরিপূরিত ও স্বাভাবিক অবস্থায় আনীত হইবার পক্ষে সমূহ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহার সত্যতা বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। স্থির ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে সহজেই ইহার উত্তর পাইতে পাইবে। ভাবিয়া দেখ, বিনা চিকিৎসাতেও কঠিন পীড়াগ্রস্ত রোগী সময়ে আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। কি প্রকারে ইহা হওয়া সম্ভব? সকলেই বলিয়া থাকেন যে, প্রকৃতি Nautre সর্ব্বদাই তাহার বিকৃতি অবস্থার পরিপূরণ বা তাহার সংস্কার সাধনে নিত্য চেষ্টাবান্ আছে। ইহা সত্য, কিন্তু প্রকৃতির তো হাত পা নাই বা ভেষজ পদার্থও নাই। তবে কেমন করিয়া এতাদৃশ কার্য্যাদি সম্পন্ন হইতে পারে? অনন্ত সৃষ্টি কৌশলী সেই পরম দয়াবান শাশ্বতঃ জগদীশ্বরেরই অনন্ত করুণারই ইহা একটি নিদর্শনমাত্র। অর্থ নাই বলিয়া দরিদ্র রোগে ভুগিয়া অকালে মারা যাইবে ইহা কখনই হইতে পারে না। এই জন্যই দেহ মধ্যস্থ অস্থি, মেদ, মজ্জা, স্নায়ু, তন্তু, বায়ু রস, ইত্যাদি পৃথক সমবায় ক্রিয়া ফলে দেহস্থ বিকৃতাবস্থা স্বাভাবিকত্বে ফিরিয়া আসিতে পারার কল্পনা তিনিই করিয়া রাখিয়াছেন—যিনি উহাদিগকে জগতের আলোক দেখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

সুমার্জ্জিত জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন মানব এত দিন আত্ম জ্ঞান গরিমায় উৎফুল্ল থাকিয়া নিজ নিজ কল্পনাপ্রসূত রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহারে দেহস্থ বিকৃতাবস্থা বিদূরীত করিবার জন্যই সচেষ্ট ছিল; কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী এবম্পকারে পরীক্ষা লব্ধ ও কল্পিত জ্ঞানাদির প্রয়োগ প্রবর্ত্তনে যখন দেখিতে ও বুঝিতে পারিল যে, "অত্যুন্নত জ্ঞান শিখরে উন্নীত হইয়া রোগ নিরাময়ের চেষ্টায় যাইয়া ক্রমশঃ উহা বর্দ্ধিত করিয়াই দিতেছে"—তখন কয়েক জন শাস্ত সুধীর ব্যক্তির মাথায় আসিল—"ব্যাধি হরণের প্রকৃত জিনিস নিশ্চয়ই অন্য কোথাও নাই, যদি কোথাও থাকে তবে তাহা ব্যাধিগ্রস্ত শরীরের মধ্যেই আছে। সুতরাং পীড়া নিরাময়ের জন্য পীড়িতের শরীরের পদার্থ বিশেষই প্রধান সাহায্যকারী—এই insqrition বা ইঙ্গীত হইতেই বর্ত্তমান সময়ের এণ্ডোক্রিণম্ বা হর্ম্মানিস জাতীয় পদার্থ দ্বারা চিকিৎসা প্রথা অবলম্বিত হইতেছে।

'চক্রদত্তে'র প্রথম শ্লোকের টীকা।*

—:•:—

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভাগবতভূষণ)

—•:০:•—

"চক্রদত্ত" একখানি উৎকৃষ্ট আয়ুর্ব্বেদীয় সংগ্রহ-গ্রন্থ। "শ্রীচক্রপাণিরিহ কর্ত্তৃপদাধিকারী" ইত্যাদি উল্লেখে গ্রন্থকার তাহতে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। এই গ্রন্থের "তত্ত্ব চন্দ্রিকা" নাম্নী টীকা ধীমান্ শিবনাথ সেন কৃত।

মূলগ্রন্থের মঙ্গলাচরণে নিম্নলিখিত শ্লোক দেখা যায়:—

গুণত্রয়বিভেদেন মূর্ত্তিত্রয়মুপেয়ুষে।
ত্রয়ীভুবে ত্রিনেত্রায় ত্রিলোকীপতয়ে নমঃ॥

ইহার টীকায় উক্ত টীকাকার বলিতেছেন,—"গুণত্রয়ং সত্ত্বরজস্তমোরূপং মূর্ত্তিত্রয়ং ব্রহ্মহরিহরস্বরূপম্।" পৌর্ব্বাপৌর্য্যানুসারে ইহাতে ব্রহ্মাকে সত্ত্বগুণাত্মক, হরিকে রজোগুণাত্মক এবং হরকে তমোগুণাত্মক বুঝায়। অনেকে ইহাতে আপত্তি করেন। তাঁহারা বলেন, "ব্রহ্মা রজোগুণাত্মক, হরি বা বিষ্ণু সত্ত্বগুণাত্মক এবং হর তমোগুণাত্মক ইহাই প্রসিদ্ধি; তবে টীকাকার অন্যরূপ বলেন কেন? এরূপ বলা তাঁহার ভ্রম ভিন্ন কিছুই নহে।" আমরা এই আপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলিব। প্রথমে, বিষ্ণুরজোগুণাত্মক হওয়া সম্ভব কিনা, তাহা দেখিব।

ভগবত্তত্ত্বসম্বন্ধে প্রথমতঃ কোন কোন পুরাণাদিতে শ্রীভগবানের কেবলমাত্র ত্রিতয়ত্ব (অর্থাৎ ত্রিগুণ-ভেদে ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুত্ব, শিবত্ব) স্বীকৃত হইয়াছে। সে সকলে তাঁহাদের "একেই তিন ও তিনেই এক" বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, কোথায়ও বা তাঁহাদের অতিরিক্ত এক স্বতন্ত্র ত্রিগুণাত্মক পরমেশ্বরের বিষয় উক্ত হইয়াছে। যেমন 'চণ্ডী'তে নারায়ণকে বলা হইয়াছে:—

—জগৎস্রষ্টা জগৎপাতাত্তি যো জগৎ।

এখানে স্রষ্টা, পাতা, সংহর্ত্তা—একাধারে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিব—নারায়ণই। তাঁহার কাছে ত্রিমূর্ত্তির ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের "কদর" কাজেই কম। আবার শিব পূজাকালে—

বিধিবিষ্ণুশিবস্তুত পাদযুগং।
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥

বলিয়া যে স্তব পাঠ করা হয়, তাহাতে তৎকালে পূজিত শিবকেই বিধি বিষ্ণু-শিব কর্ত্তৃক স্তুত বলা হইয়া থাকে। এ ত শিবেরই পূজা হইতেছে, তবে আবার কোন শিব তাঁহাকে স্তব করেন বলি? ইহাতেই বুঝা যায় যে, যে শিব স্তব করেন বলা হয়, তিনি ত্রিমূর্ত্তির অন্যতম—নামান্তর রুদ্র। তিনি ব্যষ্টি, আর পূজ্যমান্ শিব সমষ্টি। অর্থাৎ রুদ্র ত্রিগুণের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। কাজেই তাঁহার পক্ষে সমষ্টি-শিবকে স্তব করা অযৌক্তিক নহে। মঙ্গলাশ্রবণের শ্লোক, যাহা আমরা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাও একপ্রকার ইহার দৃষ্টান্ত। এখন তন্ত্র হইতে এক স্থান উদ্ধৃত করি:—

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ।
এতে সর্ব্বে খুরাঃ প্রোক্তাঃ ফলকোঽস্ত পরংশিবঃ।

* কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদসভায় সম্প্রতি লেখক কর্ত্তৃক পঠিত। আঃ সং।

এখানে ত্রিমূর্ত্তির অতিরিক্ত "ঈশ্বর," তদতিরিক্ত "সদাশিব," তদতিরিক্ত "পরমশিব," স্বীকার করা হইয়াছে। এই পরম শিবই এখানে "একমেবাদ্বিতীয়ম্"। এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অবশ্য, এ সকলের বিশেষ অর্থ আছে, অন্য উদ্দেশ্যও আছে, কিন্তু সে সকল এখন আমাদের আলোচ্য নহে।

তৃতীয়তঃ, উপরোক্ত দুই ভাবের ভগবত্তা নির্দ্দেশ ব্যতীত আরও এক ভাবে উহা নির্দ্দিষ্ট হইতে দেখা যায়। নারদ-পঞ্চরাত্র, মার্কণ্ডেয় পুরাণ (ইহা বৈষ্ণব-পুরাণ মধ্যে গণ্য) শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতিতে শ্রীভগবানের চতুর্ব্ব্যূহের উল্লেখ আছে। এই চতুর্ব্ব্যূহের মধ্যে প্রথম, বাসুদেব; ইনি ত্রিগুণাতীত—সুতরাং অরূপ, ব্রহ্মস্থানীয়। দ্বিতীয়, সঙ্কর্ষণ; ইনি তমোগুণাত্মক (অবতারদিগের মধ্যে ইনিই বলদেব—তমোগুণের অনেক লক্ষণ, যথা অযথাক্রোধ, দম্ভ, পানদোষ প্রভৃতি ইঁহার চরিত্রে পরিস্ফুট দেখা যায়। পক্ষান্তরে, তমোগুণাত্মক রুদ্রতেও ঐরূপ বিশ্বসংহারক ক্রোধ ভাঙ্গ-ধুতুরায় প্রবৃত্তি প্রভৃতি আরোপিত হইয়াছে) তৃতীয়, প্রদ্যুম্ন; ইনি সত্বগুণাত্মক। চতুর্থ, অনিরুদ্ধ; ইনি রজোগুণাত্মক, শেষশয্যাশায়ী—সৃষ্টিকর্ত্তা। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ইঁহার মূর্ত্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে:—

চতুর্থী জলমধ্যস্থা শেতে পন্নগতল্পগা।
রজস্তস্যা গুণঃ সর্গং সা করোতি সদৈব হি॥

শেষোক্ত তিন ভাব অন্যত্রকথিত ত্রিমূর্ত্তিরই অনুরূপ। প্রদ্যুম্ন—বিষ্ণু, অনিরুদ্ধ—ব্রহ্মা, এবং সঙ্কর্ষণ—রুদ্র। ইহাতে এই তর্ক হইতে পারে যে, যিনি শেষশায়ী অর্থাৎ অনিরুদ্ধ, তাঁহা হইতেই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছে। তবে আবার তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা কিরূপে হইবেন? ইহার উত্তর এই যে, ব্রহ্মা অব্যক্ত-জন্মা হইলেও একরূপ প্রথম সৃষ্ট—সৃষ্টির আদিভূত। মতবিশেষে তাঁহার ললাট হইতেই রুদ্রের উৎপত্তি। তাহা হইলে শেষ-শায়ীকেই সকল সৃষ্টির মূল বলিতে হইবে। সুতরাং তাঁহাকে যে উপরের শ্লোকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত নহে। আবার ব্রহ্মার মানসপুত্র প্রজাপতিরাই জীবাদি সৃষ্টি করিয়াছেন; তাঁহারা আমাদের পিতৃস্থানীয় এবং ব্রহ্মা পিতামহ-স্থানীয়; সেইজন্য তাঁহাকে লোকপিতামহ বলে। যে কারণে তিনি আমাদের পিতামহ, সেই কারণেই নারায়ণ আমাদের প্রপিতামহ এবং শাস্ত্র সেই নামেই তাঁহাকে অনেক স্থানে অভিহিত করিয়াছেন। গীতায় একাদশে অর্জ্জুন তাঁহাকে বলিতেছেন:—

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্ক
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।

শঙ্কর বলেন,

"প্রপিতামহশ্চ পিতামহস্যাপি পিতা প্রপিতামহোব্রহ্মণোঽপি পিতা ইত্যর্থঃ"।

স্বামিপাদ এবং সরস্বতীও ঐরূপ অর্থ করিয়াছেন।

গয়াকৃত্যের মন্ত্রে ও তাঁহাকে বলা হয়:—

ওঁ কলৌ মহেশ্বরা লোকা
যেন তস্মাৎ গদাধরঃ।
লিঙ্গরূপো ভবেত্তঞ্চ
বন্দে শ্রীপ্রপিতামহম্।
ইত্যাদি।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পূর্ব্বকথিত চতুর্ব্ব্যূহের উল্লেখ আছে। যথা:—

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ।
ইত্যাদি।

দেখা যায় যে, মার্কণ্ডেয় পুরাণ-কথিত শেষশায়ী অনিরুদ্ধকেই সাধারণতঃ নারায়ণ বা হরি বলা হইয়া থাকে। দেখাইয়াছি, ইনি রজোগুণাত্মক এবং ত্রিমূর্ত্তির অন্যতমও বটেন। কাজেই তাঁহাকে "তত্ত্বচন্দ্রিকা" টীকাকারের রজোগুণাত্মক বলা অশাস্ত্রীয় হয় নাই। কৃষ্ণাবতার গ্রহণ করিবার জন্য এই শেষশায়ীর নিকটেই দেবতাগণ আসিয়া স্তব করেন। আমরা দেখিব যে, তাঁহার সে অবতারও রজো গুণের। ভবিষ্যপুরাণে আছে :—

ঐশ্বরং তত্ত্বচঃ শ্রুত্বা গত্বং প্রাক্রমতাত্মভূঃ।
ক্ষীরোদে যত্র বৈকুণ্ঠঃ সুপ্তঃ স ভুজগোপরি।
হংসপৃষ্ঠে সমারুহ্য হরেরস্তিকমাযযৌ ॥

এখন, কারণজলে—ক্ষীরোদ-সমুদ্রে—যিনি অনন্ত-শয্যাশায়ী হরি, তিনিই ভবিষ্যপুরাণে বৈকুণ্ঠনাথ বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং ক্ষীরোদেই বৈকুণ্ঠধাম উহাতে উক্ত হইয়াছে। আবার ভাগবতে দেখা যায় যে, শঙ্খচক্রাদিধারী চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠনাথই কংস-কারাগারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার জন্ম হইলে ভাগবতে এইরূপ বর্ণনা দেখা যায় :—

তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং
চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধম্

এখন পুরাণাদির কথা ছাড়িয়া দিয়া সাধারণ বুদ্ধিতে একটি কথা বলা যায় যে, নারায়ণ যদি শুদ্ধ সত্ত্বগুণবিশিষ্টই হইবেন, তবে তাঁহার হস্তে উদ্যত ভয়ঙ্কর গদা-চক্রাদি অস্ত্র কেন? কেবল সত্ত্বগুণে ত মারাকাটা সম্ভবে না? তবেই স্বীকার করিতে হইবে যে, এ হেন অস্ত্রধারী পুরুষের অন্ততঃ একটুও রজোগুণ আছে। আর যদি তিনি পালন-কর্ত্তাই (সত্ত্বগুণাত্মক) হন, তবে দুষ্টের দমন ভিন্ন পালন হইয়তই পারে না। দমন রজোগুণের কার্য্য। অতএব সত্ত্বগুণাত্মক পালন-কর্ত্তাতে একটু রজোগুণ না থাকিলে পালন হইতেই পারে না। আবার দেখুন, সরস্বতী সত্ত্বগুণাত্মিকা; তথাপি তাঁহার দ্বারাই শুম্ভনিশুম্ভবধ সংঘটিত হইয়াছিল। তৎ-সম্বন্ধে 'বৈকৃতিক রহস্য' নামক তন্ত্রে লিখিত আছে :—

গৌরীদেহাৎ সমুদ্ভূতা যা সত্ত্বৈকগুণাশ্রয়া।
সাক্ষাৎ সরস্বতী প্রোক্তা শুম্ভাসুরনিবর্হিণী ॥

পাঠক, "সত্ত্বৈকগুণাশ্রয়া" পাঠের প্রতি লক্ষ করিবেন। তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, ঐ সত্ত্বগুণেও রজোগুণের আশ্রয়বশতঃ বধ-কার্য্য সম্ভব হইয়াছিল; নতুবা তাহা অসম্ভব। জগদ্বরেণ্য নাগোজী ভট্ট "চণ্ডীর" টীকার উপক্রমণিকায় বিষ্ণুসম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

বিষ্ণুঃ সরস্বতীজন্যত্বাৎ সাত্ত্বিকঃ কর্ম্মতঃ,+
+রূপতস্তমোময় ইতি। তত্র সত্ত্বতমসোঃ সমতা।

অর্থাৎ "প্রাধানিক রহস্য" তন্ত্রমতে বিষ্ণুর উৎপত্তি সরস্বতী হইতে। ঐ সরস্বতী সাত্ত্বিকী; সুতরাং পালনকর্ত্তা বিষ্ণুও সাত্ত্বিক, ইহাই বলা নাগোজীর উদ্দেশ্য। অথচ বিষ্ণু অসুর নিধন করিয়াছেন। শুদ্ধ সত্ত্বগুণে এমনটা কিরূপে হয়, তাহা বুঝিতে হইলে নাগোজীর "তত্র সত্ত্বতমসোঃ সমতা" এই কথা বুঝিলেই হইল। অর্থাৎ বিষ্ণুতে রজোগুণও আছে, কারণ সত্ত্ব ও তমোগুণের সমবায়েই রজোগুণ। মার্কণ্ডেয়-পুরাণও ঠিক ঐ কথা বলেন; যথা :—

তিলেষু বা যথা তৈলং ঘৃতং পয়সি বা স্থিতম্।
তথা তমসি সত্ত্বে চ রজোপ্যনুস্যূতং স্থিতম্ ॥

ইহা অবশ্য একটি দার্শনিক সত্য।

আর এক কথা। শেষশায়ী নারায়ণ কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া আদর্শকর্ম্মী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করি সেরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান প্রবল রজোগুণ ব্যতীত কি সম্ভব? রজোগুণই ত ক্রিয়াত্মক। কাজেই, 'চক্রদত্তে'র টীকাকারের হরিকে রজোগুণাত্মক বলা দোষের কিসে? পরন্তু ইহা শাস্ত্রানুমোদিতও বটে। অবশ্য মার্কণ্ডের পুরাণ শেষশয্যাশায়ীর কৃষ্ণাবতারত্ব স্বীকার করেন না, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণও তাহা প্রকারান্তরে স্বীকার করেন না। অর্থাৎ তাঁহাকে অবতারী-কৃষ্ণ বলেন না। তাঁহারা অনন্য-সাধারণ বিচারশক্তি দেখাইয়া বলেন :—

কৃষ্ণোঽন্যোয়ং যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্র-নন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি॥

কিন্তু কোনকোন পুরাণ যে শেষ শয্যা-শায়ীর কৃষ্ণাবতারত্ব স্বীকার করেন, তাহা আমরা ভবিষ্যপুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বে দেখাইয়াছি।

এখন হরির রজোগুণ প্রতিপাদক ভাবের আর এক দিক দেখি। তাঁহারই জন্মাষ্টমী-ব্রতানুষ্ঠানের একটি মন্ত্র এই:—

যং দেবং দেবকীদেবী বাসুদেবাদজীজনৎ।
ভৌমস্য ব্রহ্মণো গোপ্ত্রে তস্মৈ ব্রহ্মাত্মনে নমঃ॥

"ভৌমস্য ব্রহ্মণো গোপ্ত্রে" এই পাঠের অর্থ এই:—ভৌম, মঙ্গল; তাঁহার ব্রাহ্মণদিগের রক্ষা-কর্ত্তা যিনি,তাঁহাকে। এখন মঙ্গল হইতেছেন সাম-বেদাধিপ, তাঁহার ব্রাহ্মণ হইতেছেন সামবেদীয়গণ, আর পূর্ব্বকথিত মন্ত্রানুসারে, তাঁহাদের রক্ষা কর্ত্তা হইতেছেন হরি—নারায়ণ। গীতায় তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন;:—

"বেদানাং সামবেদোঽস্মি, আর, "গায়ন্তি যং সামগাঃ" ইত্যাদি কথাও শাস্ত্রে আছে, তদ্ভিন্ন উক্ত ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞোপবীত গ্রন্থী দেওয়ার পর"এতৎ যজ্ঞোপবীতসূত্রং ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্ত" এই উৎসর্গ মন্ত্র বলিয়া তাহা ব্যবহার করার বিধিও আছে। পরন্তু মঙ্গল রজোগুণাত্মক গ্রহ—তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয় বলিয়া জ্যোতিষ শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাঁহার ধ্যানে আছে:—

"আবন্ত্যং ক্ষত্রিয়ং রক্তং" ইত্যাদি।

তাঁহার রক্তবর্ণে তাঁহার রজোগুণ বুঝাইতেছে। গুণ-ত্রয়ের বিভিন্ন বর্ণ-কল্পনার কথা আমরা পরে বলিব। তিনি ক্ষত্রিয় জাতি সুতরাং সত্ত্ব-রজোধর্ম্মাত্মক। শাস্ত্রে চতুর্ব্বর্ণের গুণ এইরূপ কথিত হইয়াছে; ব্রাহ্মণ সত্ত্ব অথবা সত্ত্ববহুল; ক্ষত্রিয় সত্ত্ব-রজঃ, অর্থাৎ রজোবহুল; বৈশ্য রজস্তমঃ, অর্থাৎ তমোবহুল; শূদ্র কেবল তমঃ। তাহা হইলে সত্ত্ব-রজোধর্ম্মী মঙ্গলের ব্রাহ্মণদিগের একটু রজোগুণ থাকাও অবশ্য স্বীকার করিতে হয়—সেটা অন্য বেদীয় ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় তাঁহাদের অভিচার-ক্রিয়া অভিসম্পাত ও আদি কার্য্যে বিলক্ষণ প্রতীত হয়। এখন মঙ্গলের ব্রাহ্মণদিগের এইরূপ গুণ হইলে তাঁহাদের রক্ষাকর্ত্তা হরিও যে একেবারে রজোগুণ-বিবর্জ্জিত হইতে পারেন, এমনটা সম্ভব নহে। কারণ সাধক যেমন, সাধ্যও অনেকটা সেই রূপ না হইলে পরস্পর 'খাপ'খায় না।

অপিচ তাঁহাতে রজোগুণ আছে বলিয়াই মাংস দিয়া বিষ্ণুর ভোগ দেওয়ার বিধি পদ্ম-পুরাণে দেখা যায়। কারণ, সত্ত্বগুণে

ননাদি কার্য্য নাই; রজোগুণে তাহা আছে। সেই জন্য দুর্গোৎসবের সময় কোন কোন স্থানে সপ্তমী (সাত্বিকী তিথি) পূজায় বলিদান হয় না; অষ্টমী (রাজসিকী তিথি)পূজায় ও নবমী (তামসী তিথি) পূজায় তাহা হইয়া থাকে। জগদ্ধাত্রী পূজাতেও প্রথম প্রহরের পূজাকালীন কোথাও কোথাও বলিদান হয় না; অপর প্রহরদ্বয়ের পূজায় (রাজসী ও তামসী) তাহা হইয়া থাকে। এই প্রথম পূজা-সম্বন্ধে বিশ্বসার-তন্ত্র বলিয়াছেন,— "প্রথমে সাত্বিকী পূজা"।

পুনশ্চ, তিথি বিচারে সপ্তমী সাত্বিকী বলিয়া যাত্রিক, অষ্টমী রাজসী বলিয়া যাত্রা সম্বন্ধে প্রশস্তা নহে, আর নবমী তামসী বলিয়া উহা সর্ব্বকার্য্যে একেবারে পরিত্যজ্যা। এইবার দেখুন, শেষশায়ী নারায়ণ কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতেই কৃষ্ণরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; অতএব তাঁহাতে রজোগুণের কল্পনা অসম্ভব নহে।

এইবার আমাদের বক্তব্য অধিকতর পরিস্ফুট করিবার জন্য আয়ুর্ব্বেদের মুখ চাহিয়া দুই একটি কথা বলিব। আমাদের বায়ু, পিত্ত, কফ বলিয়া যে তিন নাড়ী আছে, উহারাই এক একটি ত্রিগুণের ব্যষ্টিভাব, অর্থাৎ আমাদের দেহরূপ ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডে উহারাই সেই পৌরাণিক ত্রিমূর্ত্তি। দৈনন্দিন ব্যাপারে আমাদের প্রভাতে শ্লেষ্মার আধিক্য, মধ্যাহ্নে পিত্তাধিক্য ও সায়াহ্নে বায়ুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মানবের আয়ুষ্কালের যে প্রধান তিন ভাগ—বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য—বায়ু পিত্তাদিরও এক একটি তত্তৎভাগের এক এক ভাগে পর্য্যায়ক্রমে প্রবল হইয়া থাকে। বার্দ্ধক্যে বায়ুর প্রাবল্য হয়। এই বায়ুকেই আমাদের শেষাস্তরণ-শায়ী নারায়ণ বলিয়া ভাবিতে পারা যায়—যাঁহাকে মার্কণ্ডেয়-পুরাণে রজোগুণাত্মক বলা হইয়াছে, আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। এই বায়ু-সম্বন্ধে সুশ্রুত লিখিয়াছেন:—

স্বয়ম্ভূরেষ ভগবান্ বায়ুরিত্যভিশব্দিতঃ।

* * * *

স্থিত্যুৎপত্তিবিনাশেষু ভূতানামেব কারণম্।

* * * *

তির্য্যগ্‌গো দ্বিগুণশ্চৈব রজোবহুল এবচ।
অচিন্ত্যবীর্য্যো দোষাণাং নেতা রোগসমূহরাট্।

এখন দেখুন, এই বায়ুকেই "রজোবহুল" বলা হইয়াছে। ইহা সত্ত্বগুণবিশিষ্ট বটে, কিন্তু তদপেক্ষা ইহাতে রজোগুণের আধিক্য; অধিকন্তু ইহা প্রাণীদিগের সৃষ্টিস্থিতি ও বিনাশের কারণ, এবং তির্য্যগ্‌গামী (সর্প-গতি-বিশিষ্ট) অপিচ ইহা পিত্ত ও কফের পরিচালক রোগের প্রবর্ত্তকরূপে রোগ-সমূহের রাজা—অচিন্ত্যবীর্য্য। শেষশায়ী-সম্বন্ধেও এই সকল কথা ঠিক খাটে। তিনি রজোগুণাত্মক তাহা ত পুরাণেই দেখা যায়—সে সম্বন্ধে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি; রজোগুণবিশিষ্ট বলিয়াই তিনি বায়ুর ন্যায় সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশেরও হেতুভূত। কারণ, আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে রজোগুণ সত্ত্বেও আছে, তমোগুণেও আছে। এখানে একবার 'চণ্ডী'র নারায়ণ-সম্বন্ধে পূর্ব্বকথিত "জগৎস্রষ্টা জগৎ-পাতাত্তি যো জগৎ" এই শ্লোকাংশ মনে করিলেই আমাদের কথা বিশদ হইবে। আবার হরি দেবতাদিগের নেতাস্বরূপ; দেবতাদিগের যত "আবদার,' তাঁহারই কাছে,

"দেবানাঞ্চ যথা হরিঃ", ইত্যাদি কথা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণে দেখা যায়, হরব্রহ্ম-প্রমুখ দেবগণ তাঁহাকে ত্রিভুবনেশ্বরের পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ফলে, হর ও ব্রহ্মা (অপর দুই গুণের ব্যষ্টিভাব এবং নাড়ী-বিচারে অন্য নাড়ীদ্বয়) তাঁহার দ্বারা শাসিত বা পরিচালিত হইতেন। এই জন্য শাস্ত্রে তিনি "ত্রিভুবনাধীশ" বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছেন। বায়ু যেমন "নেতা" ও "রোগ-সমূহ-রাট্, তিনিও তদ্রূপ নেতা, পরিচালক, শাসক, বা দেব-রাট পক্ষান্তরে তিনি জনার্দ্দন। এই "রোগ-সমূহরাট্" ও "জনার্দ্দন" কথার পার্থক্য কোথায়? রাজ সম্মানও নারায়ণের রজোগুণের পরিচায়ক ; কারণ রাজা রজোগুণাত্মক, সত্ত্বগুণে শাসন কার্য্য চলিতেই পারে না। পুরাকালের শাস্ত্র বিধি-অনুসারে রজোগুণাত্মক ক্ষত্রিয়গণই রাজ-পদার্হ ছিলেন। এখনও এতদ্দেশে সাধারণের বিশ্বাস আছে যে, কাহারও মাথার উপর সাপে ফণা ধরিলে সে রাজা হয়। রাজা নারায়ণের সর্পশয্যাই ঐরূপ বিশ্বাসের ভিত্তি। অপিচ বায়ু যেমন তির্য্যগ্‌গ, নারায়ণ ও সেইরূপ তির্য্যগ্‌গ, কারণ তিনিও তির্য্যক্‌যোনি অনন্তরূপী সর্পশয্যায় শয়িত। এই অনন্ত-মূর্ত্তি-সম্বন্ধে মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলিয়াছেন :—

তামসী সা সমখ্যাতা তির্য্যক্তং সমুপাশ্রিতা।

তচ্ছিন্ন শয়িতা-মূর্ত্তিকে (নারায়ণকে) উক্ত পুরাণ "পন্নগতল্পগা" বলিয়াছেন। সে শ্লোক আমরা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। পুনশ্চ, বায়ুকে সুশ্রুত যে "অচিন্ত্যবীর্য্য" বলিয়াছেন, শাস্ত্রে নারায়ণকে ঠিক তাহাই বলা হইয়া থাকে। "চণ্ডী"তে নারায়ণী-শক্তিকে

"ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা"

বলা হইয়াছে, সুতরাং বিষ্ণু বা নারায়ণও অনন্তবীর্য্য ; এবং তাহা হইলে তিনি বায়ুর ন্যায় অচিন্ত্য-বীর্য্যও বটেন, কারণ অনন্তবীর্য্যের অনন্তভাবের চিন্তা হয় না—তাহা অচিন্ত্য।

মতান্তরে, এই শয়িত পুরুষ-শক্তি সরস্বতী-কেই ঋগ্বেদীয় সায়ং সন্ধ্যাকালীন

"ওঁ বৃদ্ধাং বৃদ্ধাদিত্যমণ্ডলস্থাং শ্যামাম্বরানু-লেপনস্রগাভিভরণাং একবক্ত্রাং শঙ্খচক্র-গদাপদ্মাঙ্ক চতুর্ভুজাং গরুড়ারূঢ়াং বিষ্ণু দৈবতাং সামবেদমুদাহরন্তীং স্বর্লোকাধিষ্ঠাত্রীং সরস্বতীং নাম তাং ধ্যায়েৎ।"

বলিয়া ধ্যান করিতে হয়। পাঠক দেখিবেন, জীবনের সন্ধ্যায় অর্থাৎ বার্দ্ধক্যে বায়ুর প্রাবল্য হয়, এবং সেই বায়ুই শেষ-শায়ী এবং শেষ-শায়ীই যে সামবেদের দেবতা তাহা আমরা বলিয়াছি। সেই জন্য দিবসের বার্দ্ধক্যে অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে সেই সামবেদোচ্চারণকারিণী বৃদ্ধা সরস্বতী নাম্নী শেষশায়ীর শক্তিকে স্মরণ করিতে হয়। এ সকল কি আমাদের কথার পোষকে যায় না? স্মরণ রাখিতে হইবে, "শক্তি-শক্তয়োরভেদম্"। আর ঐ শক্তি যে বৃদ্ধা, তাহার অন্যতম কারণ, তিনি প্রপিতামহ-মহাশয়ের শক্তি—সাক্ষাৎ প্রপিতামহী।

আর এক কথা। যে সকল দেবমূর্ত্তি আমরা সর্প সংযুক্ত বা সর্পভূষিত দেখিতে পাই, সে সকল রাজসী বা তামসী। গুণত্রয়ের যে সকল বর্ণ শাস্ত্রে কল্পিত হইয়াছে, তদনুসারে সাধারণতঃ সাত্ত্বিকী মূর্ত্তি শ্বেতবর্ণা, রাজসী রক্তবর্ণা এবং তামসী কৃষ্ণবর্ণা এবং প্রায়শই দিগম্বরা এবং মুণ্ডমালাধারিণী দেখিতে পাওয়া যায়।

সরস্বতী সাত্ত্বিকী, অতএব শ্বেতবর্ণা। জগদ্ধাত্রী দুর্গা রাজসী—অতএব রক্তবর্ণা, অধিকন্তু নাগযজ্ঞোপবীতিনী, আর সংহারিণী কালী তামসী—অতএব ঘোরকৃষ্ণবর্ণা, মহামেঘ-প্রভাশ্যামা, পরন্তু মুণ্ডমালাধারিণী ও দিগম্বরী। আমরা যে কথা বলিতেছি, তাহা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক শিবের নিম্নলিখিত শাস্ত্রোক্তধ্যানত্রয়ে স্পষ্ট বুঝা যাইবে :—

(সাত্ত্বিক ধ্যান)

বন্দে বালং স্ফটিকসদৃশং কুণ্ডলোদ্ভাসি বক্ত্রং
দিব্যাকল্পৈর্নবমণিময়ৈঃ কিঙ্কিণীনূপুরাদ্যৈঃ।
দীপ্তাকারং বিশদবসনং সুপ্রসন্নং ত্রিনেত্রং
হস্তাব্জাভ্যাং বটুকমনিশং শূলদণ্ডৌ দধানম্ ॥

(রাজস-ধ্যান)

উদ্যদ্ভাস্করসন্নিভং ত্রিনয়নং রক্তাঙ্গরাগস্রজং
স্মেরাস্যং বরদং কপালাভয়ং শূলং দধানং করৈঃ
নীলগ্রীবমুদার ভূষণশতং শীতাংশুচূড়োজ্জ্বলং
বন্ধূকারুণবাসসং ভয়হরং দেবং সদা ভাবয়ে ॥

(তামস ধ্যান)

ধ্যায়েন্নীলাভ্রকান্তিং শশিকলধরং মুণ্ডমালং মহেশং
দিগ্বস্ত্রং পিঙ্গকেশং ডমরুমথ সৃণিং খড়্গশূলা-ভয়ানি।
নাগং ঘণ্টাং কপালং কর-সরসিরুহৈ বিভ্রতং ভীমদংষ্ট্রং
সর্পাকল্পং ত্রিনেত্রং মণিময়বিলসৎকিঙ্কিণী নূপুরাঢ্যম্ ॥

সাত্ত্বিক-ধ্যানলিখিত "স্ফটিকসদৃশম্" "বিশদবসনম্", রাজসধ্যানের" "উদ্যদ্ভাস্কর-সন্নিভম্, "রক্তাঙ্গরাগস্রজম্" "কপালম্, "বন্ধূকারুণবাসসম্" এবং তামসধ্যান কথিত "নীলাভ্রকান্তিম্" "মুণ্ডমালম্" "দিগ্বস্ত্রম্" "নাগম্" "সর্পাকল্পম্" শব্দগুলির প্রতি আমরা পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

এখন ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, যে নারায়ণের মস্তকোপরি-সহস্র শীর্ষ সর্প ছত্রধারীস্বরূপ ফণা উন্নত করিয়া আছে, অনন্ত রূপের ধ্যানে যাঁহাকে নাগ-যজ্ঞোপবীতি বলা হইয়াছে, আর যাঁহার বাহন গরুড়কেও শাস্ত্রে "দুষ্টাহিচ্ছেদীতুণ্ড" বলা হইয়াছে, সেই অনন্ত-নারায়ণরূপ ঠিক তমোগুণের হইতে পারে না, অথবা সত্ত্বগুণেরও হইতে পারে না—পরন্তু উহা এতদুভয়ের মধ্য-বর্ত্তী রজোগুণ-বিশিষ্ট হওয়াই সম্ভব। "অনন্ত নারায়ণের" ধ্যান নিম্নে দেওয়া গেল ; তাহা দেখিয়া পাঠক বিচার করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, বর্ণে তিনি সত্ত্বগুণাত্মক, আয়ুধে তাঁহার রজোগুণসূচিত এবং সর্প-সংযুক্ত ইত্যাদি কারণে তাঁহাতে তমোগুণও আছে বুঝা যায়। অর্থাৎ তিনি ত্রিগুণাত্মক, অথবা এককথায় তিনি রজোগুণশালী। কারণ রজোগুণ সত্ত্বেও আছে, তমোগুণেও আছে। ইহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। এই নারায়ণের প্রকৃতি স্বয়ং দেবী দুর্গা—তিনিও ত্রিগুণাত্মিকা—রজো-প্রধানা। তাঁহাই তাহারা একটি নাম রাজসী। অনন্তের ধ্যান যথা :—

ওঁ দিব্যসিংহাসনাসীনং দেবেশং গরুড়ধ্বজম্।
শুক্লবর্ণং চতুর্ব্বাহুং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্ ॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং পীতাম্বরং বিভুম্।
শ্রিয়া বাণ্যা চ সংশ্লিষ্টং কিরীটাদি সমুজ্জ্বলম্ ॥
ফণাশতসমাযুক্তং জগন্নাথং জগদ্গুরুম্।
অনন্তং চিন্তয়েদ্দেবং নারদাদৈরুপস্তুতম্ ॥

এখন ব্রহ্মার সম্বন্ধে কিছু বলি। টীকাকার

ব্রহ্মাকে রজোগুণাত্মক না বলিয়া সত্ত্বগুণবিশিষ্ট বলিয়াছেন। দেখা যায়, ব্রহ্মা অস্ত্রধারী নহেন, কাহাকেও দমন বা বধ করা তাঁহার কার্য্য নহে। তিনি বেদ, জপমালা, কমণ্ডলু ইত্যাদি লইয়া এক হিসাবে সত্ত্বগুণোচিত আচার-পরায়ণ। তাঁহা হইতে উদ্ভূত ব্রাহ্মণগণকে সাত্ত্বিক বলা হইয়া থাকে, তবে স্বয়ং তাঁহাকে সাত্ত্বিক ভাবিতে দোষ কি? "চণ্ডী"তে দেখা যায় যে, শুম্ভনিশুম্ভ-বধের সময় সকল দেবশক্তি মাতৃগণই অস্ত্রগ্রহণে সংহার-কার্য্যে ব্যাপৃতা, স্বয়ং বৈষ্ণবীশক্তিও সশস্ত্রা ছিলেন, কিন্তু কেবল ব্রহ্মাণীই নিরায়ুধা। "চণ্ডীতে" সে কথা এইরূপ আছে :—

হংসযুক্তবিমানাগ্রে সাক্ষসূত্র কমণ্ডলুঃ।
আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তি ব্রহ্মাণী সাভিধীয়তে॥

এ ত দেখিতেছি অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলু—সন্ন্যাসীর জিনিস, এ কি যুদ্ধক্ষেত্রের ভরসা? তবে ব্রহ্মাণী যুদ্ধের কোন কার্য্যে লাগিলেন? "চণ্ডীতে" বলা হইয়াছে :—

কমণ্ডলু-জলাক্ষেপ হতবীর্য্যান্ হতৌজসঃ।
ব্রহ্মাণী চাকরোচ্ছত্রূন যেন যেন স্ম ধাবতি॥

অর্থাৎ শত্রুগণের প্রতি কমণ্ডলু হইতে কেবল মন্ত্রপূত বারি-প্রক্ষেপ, ইহাই ব্রহ্মাণীর একমাত্র অস্ত্র। ইহা সত্ত্বগুণাত্মক ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য—অনেকটা অভিচার-ক্রিয়ার মত বটে। তাই ইহা সত্ত্বেও রজোগুণের আভাস দেয় বলিয়া মনে হয়। সুতরাং ব্রহ্মাকে সত্ত্বগুণাত্মক ভাবিলে ক্ষতি কি? পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সত্ত্বগুণেও রজোগুণ আছে। সুতরাং ব্রহ্মাকে এই দুই গুণের যে ভাবে বুঝ, তিনি অল্লাধিক তাহাই, ইহা একরূপ বলা যাইতে পারে।

টীকার উল্লেখিত হরসম্বন্ধে টীকাকারের সহিত সাধারণের মত-ভেদ নাই। সুতরাং আমাদের সে সম্বন্ধে বলিবার ও কিছু নাই।

উপসংহারে আবার বলি, টীকাকার কোন অশাস্ত্রীয় অসঙ্গত কথা আলোচ্য টীকা-সম্বন্ধে বলেন নাই। বলিলে এ টীকার এত কাল ধরিয়া আদর থাকিবে কেন? সাধকের প্রকৃতি অনুসারে তাহার ইষ্ট দেবতা নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় একেশ্বর-সম্বন্ধে পুরাণাদিতে বহুমত দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ নাগোজী ভট্ট দেবী ভগবতী মহালক্ষ্মী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, তিনি "লিঙ্গংযোনিঞ্চ বিভ্রতী—ইত্যনেনাস্যাঃ পুংরূপত্বং স্ত্রীরূপত্বং চ ধ্বনিতম্। এতদেব রূপং শৈবাঃ সদাশিব ইত্যাহুঃ। বৈষ্ণবাঃ বাসুদেব ইতি শাক্তা মহালক্ষ্মীরীতি।* * এষা শৈবী বৈষ্ণবীচ।' সুতরাং আমাদের টীকাকার যদি কোন এক বিশেষ শাস্ত্রমত অনুসরণ করিয়া তাঁহার টীকা লিখিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার ভ্রম বলা যায় না। আর ত্রিগুণ যে পরস্পরকে আশ্রয় করিয়াই থাকে, সে সম্বন্ধেও পুরাণে উল্লেখ দেখা যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলেন :—

এত এব ত্রয়ো দেবা এত এব ত্রয়োগুণাঃ।
অন্যোন্য মিথুনাহ্যেতে অন্যোন্যাশ্রয়িণস্তথা।
ক্ষণং বিয়োগো ন হ্যেষাং ন ত্যজন্তি পরস্পরম্।

ইহাতে সব তর্ক এক কথায় চুকিয়া যায়। অর্থাৎ আমরা এখন যে কথা বলিলাম, তাহাতে ত্রিমূর্ত্তির প্রত্যেকটিতেই সত্ত্বগুণ আছে, তবে তাঁহাদের এক একটিতে এক একটি বিশেষ গুণের আধিক্য আছে মাত্র, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। এখন সেই তিনেই এক, একেই তিন দাঁড়াইল। ত্রিমূর্ত্তির সম্বন্ধে ব্রহ্মা রজোগুণাত্মক, বিষ্ণু সত্ত্বগুণাত্মক

এবং হর তমোগুণাত্মক, ইহাই সাধারণতঃ পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে কোন কোন শাস্ত্র-গ্রন্থে যে সে সম্বন্ধে অন্যরূপ লিখিত আছে, তাহাই আমরা এ প্রবন্ধে দেখাইলাম।

শিব-চতুর্দ্দশী।

(কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ)।

(১)

শুভ চতুর্দ্দশী তিথি লইয়া ভকতি প্রীতি,
পূজিতে এসেছি আজ, শঙ্কর! তোমারে,
এমন দেবতা আর দেখিনি সংসারে।
প্রেমময়—অনাসক্ত ভক্তের পরম-ভক্ত,
"পূজা"ভেবে তৃপ্ত কেবা দারুণ"প্রহারে?"
এমন উদার প্রাণ আছে কি সংসারে?

(২)

স্বর্গ মর্ত্ত্য সব খুঁজে, তেত্রিশ কোটীরে পূজে
দেখিয়াছি, বুঝিয়াছি যত দয়া যা'র,
পবিত্র "দেবত্ব" আছে কোন্ দেবতার?
এত মায়া—এত স্নেহ,
জানেনা ত আর কেহ,
ইন্দ্র, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, কুবের, তপন,
দয়ার দেবতা—এরা নহে একজন!

(৩)

এ ভারত "আত্ম-ভোলা"
তুমিও যে আত্ম-ভোলা,
ধ্যান-মগ্ন—মহাদেব—বাহ্যজ্ঞান হত।
ভারতের দেব, ঠিক্ ভারতেরই মত।
তাই এত ভালবাসি—
ঈশান—শ্মশান-বাসী,
গৃহে "অন্নপূর্ণা" যা'র কুবের ভাণ্ডারী,
কি ত্যাগ-স্বীকার, তবু সে শিব ভিখারী!

(৪)

কালসর্পে—কুতুহলে, জড়া'য়ে রেখেছ গলে,
শিরে—গঙ্গা-তরঙ্গের আতঙ্ক গর্জ্জন?
ভ্রূক্ষেপ নাহিক তা'র, কি উদার মন!
নাহি মান—অপমান— সুস্থান কুস্থান জ্ঞান,
নাহি ভেদাভেদ, চির পান্থ উদাসীন!
কি অজ্ঞেয়—আপনাতে আপনি বিলীন!

(৫)

ভূত ও পিশাচে হায়! স্থান দে'ছ রাঙা পায়,
ভারতেরই মত তুমি বেদনা-বিধুর,
হে অব্যয়! হে স্বয়ম্ভু! হে চির মধুর!
সর্ব্বেন্দ্রিয় তৃপ্তি করে কোটী কাম পুড়ে মরে,
আত্মজয়ী আশুতোষ! প্রভো! পঞ্চানন!
পঞ্চভাবে, পঞ্চপ্রাণে, তোমারি আসন।

(৬)

কর্ম্ম-ক্ষেত্রে—আছে "কর্ম্ম,"
তথাপি সন্ন্যাস-ধর্ম্ম,
শক্তি বুকে, শান্তি মুখে, হর দিগম্বর!
মৃত্যুর মূরতি তুমি—সার্থক সুন্দর।
সতী-দেহ—ল'য়ে স্কন্ধে,
কেবা মত্ত প্রেমানন্দে?

কোন্ দেব জানে এত সতীর আদর?
ভারত-সতীর তেজে—মুগ্ধ চরাচর।

(৭)

সমুদ্র-মন্থনে—যবে, সম্পদ্ লভিল সবে,
তব ভাগ্যে কালকূট—বিধির লিখন—
সে বিষ, আকণ্ঠ ভ'রে ক'রেছ সেবন।
আমরাও, পেলে ক্ষুধা, বিষ খাই ভেবে সুধা,
আমাদেরও তমোগুণ—আলস্য জড়তা—
তাই তুমি ভারতের আরাধ্য দেবতা!

(৮)

'পোড়া হাড়'—'ভস্ম ছাই'—
মোদেরও সম্বল তাই,
জায়ারে অর্দ্ধেক দিয়ে "অর্দ্ধ নারীশ্বর"—
নারীর সম্মান জানে, ভারতেরও নর।
এ ম্যালেরিয়ার দেশে—
যেন "মৃত্যুঞ্জয়" বেশে
পর-হিতে, আপনার সর্ব্বস্ব বিলাই,
তোমার চরণে, প্রভো!! এই ভিক্ষা চাই॥

প্রাচীন চিকিৎসকের পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।

[কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত ত্রইচ্, এম্, বি]

—:০:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৭১) অর্জ্জুন বৃক্ষের ছাল চূর্ণ /০ আনা মাত্রায় প্রাতে ও সন্ধ্যায় কিঞ্চিৎ দুগ্ধসহ সেবনে হৃদ্‌রোগ ভাল হয়।

(৭২) হরিণের শৃঙ্গ পুটপাকে দগ্ধ করতঃ পেষণ করিয়া চার পাঁচ রতি মাত্রায় প্রত্যহ আহারের পর গরম জল অনুপানে সেবন করিলে হৃৎ বেদনা ও পৃষ্ঠ বেদনা শীঘ্র নষ্ট হয়।

(৭৩) অর্জ্জুন ছালের ক্বাথে কিঞ্চিৎ গুড় চূর্ণ ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে হৃদ্‌রোগ ভাল হয়।

(৭৪) সোমরাজী ও শুণ্ঠীচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে কুষ্ঠ প্রশমিত হয়।

(৭৫) চিরতা, বাসক ছাল, কটুকী, পটল-পত্র, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া ও রক্তচন্দন ইহাদের ক্বাথ প্রাতে ও সন্ধ্যায় পান করিলে কুষ্ঠ নষ্ট হয়।

(৭৬) সোহাগার খৈ, কর্পূর ও ঘৃত দ্বারা অগ্নিতাপে মলম প্রস্তুত করিয়া লাগাইলে কুষ্ঠরোগ ভাল হয়।

—•—

৭ম বর্ষ } চৈত্র, ১৩২৯ সাল। { ৮ম সংখ্যা।

কবিরাজী ও ডাক্তারী মতে নাড়ী পরীক্ষার আলোচনা।

[ডাঃ পি, কে, রায় চৌধুরী এল্, এম্ এফ্]

রক্তপূর্ণ ধমনীতে যখন হৃৎপিণ্ড প্রেরিত অতিরিক্ত ৩।৪ আউন্স রক্ত হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক সঙ্কোচনে ধমনীর মধ্যে প্রেরিত হইয়া ধমনীতে যে স্পন্দন উৎপন্ন করে, সেই স্পন্দনই নাড়ী নামে অভিহিত হয়।

ডাক্তারীমতে নাড়ীর ছবি Sphygmograph (স্ফীগ্‌মোগ্রাফ) নামক যন্ত্রে তুলিলে চিত্রের প্রথম রেখাটী হঠাৎ সোজা হইয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় ও পরে রেখাটী ক্রমে ক্রমে নীচের দিকে নামিতে থাকে, কেবল মধ্যে দুইটী বক্রতা দেখিতে পাওয়া যায়, রেখার শৃঙ্গটীকে Percu sion wave (পারকাসান্ ওয়েভ্) বা বায়ুনাড়ী বলে। ঐ রেখাটী যখন ক্রমে নামিতে থাকে তখন প্রথম বক্রকে Tidal Wave বা পিত্তনাড়ী ও নীচের বক্রকে Dicratic Wave বা কফ নাড়ী বলে।

কিন্তু বায়ু অর্থে বাতাস, পিত্ত অর্থে যকৃত নিঃসৃত রস এবং কফ অর্থে থুথু বা গয়ার বুঝিলে হইবে না।

বায়ু বলিতে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বুঝায় এবং ঐ হৃৎপিণ্ড আবার মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড এবং হৃৎপিণ্ড স্থিত স্নায়ু সকল হইতে Eneregy বা ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য করে (Cantral and Sympathetic nervous systems and the gongliens of the heart)

পিত্তনাড়ী অর্থে যকৃত নিঃসৃত রস না বুঝিয়া (Toxin in Circulation) রক্তমধ্যে একটী বিষাক্ত পদার্থ প্রবাহিত হইতেছে বুঝিতে হইবে।

কফনাড়ী অর্থে থুথু বা গয়ার না বুঝিয়া circulation of lymph) শ্লৈষ্মিক রস অবাধে শ্লৈষ্মিক নালীতে প্রবাহিত হইতে পারিতেছে কিনা বুঝিতে হইবে।

প্রত্যেকটীর আলোচনা।

Percussion wave বা বায়ুনাড়ী ফিজিওলজিক্যাল কারণঃ—রক্তপূর্ণ ধমনীতে হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক সঙ্কোচনে (Systab) হৃৎপিণ্ডপ্রেরিত ৩।৪ আউন্স রক্ত ধমনী মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই যে স্পন্দন উৎপন্ন করে তাহাকেই Percussion wave বা বায়ুনাড়ী বলে। Sphymograph নামক যন্ত্রে এই নাড়ীর গতি ছবি তুলিলে প্রথমেই যে রেখাটী সোজাসুজী উৰ্দ্ধে উঠিয়া থাকে, ঐ রেখার শৃঙ্গকেই Percussion wave এবং কবিরাজী মতে বায়ু নাড়ী বলা হয়। আবার হৃৎপিণ্ড মস্তিষ্ক হইতে ভেগাস্ স্নায়ু দশম যুগ্ম স্নায়ু) মেরুদণ্ড হইতে সিম্প্যাথিটিক্ স্নায়ু এবং হৃৎপিণ্ডস্থিত গ্যাংগ্লিয়ন (ganglions) সকল হইতে Energy বা ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া সঙ্কুচিত (Diastab) এবং প্রসারিত (Ditab কার্য্য করিয়া থাকে। মস্তিষ্ক হইতে উৎপন্ন ভেগাস স্নায়ু হইতে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বা স্পন্দন মৃদু হয়। মেরুদণ্ডস্থিত সিম্প্যাথিটিক্ স্নায়ু দ্বারা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বা স্পন্দন বৰ্দ্ধিত হয় (accelaritary action) এবং হৃৎপিণ্ড স্থিত গ্যাংগ্লিয়ন (Ganglious) হইতে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনকে (Augmentary action) বলশালী করে।

সুতরাং এই Percussion wave বা বায়ুনাড়ী পরীক্ষা কালীন নিম্নলিখিত তিনটী বিষয় মনোযোগের সহিত লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

১। Rate per minute.—হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন প্রতিমিনিটে কতবার হইতেছে ইহার দ্বারা ভেগাস্ স্নায়ুও সিম্প্যাথিটিক স্নায়ুর ক্রিয়া বুঝায়।

২। Rhythm :—হৃৎপিণ্ডের সঙ্কম গুলি যথাক্রমে পর পর হইতেছে কি না, ইহার দ্বারা হৃৎপিণ্ডের গ্যাংগ্লিয়নের (Ganglions) ক্রিয়া কি প্রকার হইতেছে বুঝিতে হইবে।

৩। Volume :—হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক সঙ্কোচনে রক্তপূর্ণ ধমনীতে হৃৎপিণ্ড কি পরিমাণে রক্ত প্রেরণ করিতেছে অর্থাৎ ধমনী সকল রক্তপূর্ণ বা রক্তাল্পতার (Large or small) অবস্থা বুঝায়।

Tidal Wave:—বা পিত্তনাড়ী (Toxic in circulation) অর্থাৎ রক্তমধ্যে কোন রকম বিষাক্ত পদার্থ চলাচল করিতেছে বুঝিতে হইবে।

ফিজিওলজিক্যাল কারণঃ—রক্তপূর্ণ ধমনীতে হৃৎপিণ্ড প্রেরিত অতিরিক্ত ৩।৪ আউন্স রক্ত হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক সঙ্কোচনে (Systab) প্রবেশ করিয়া ধমনীতে যে আঘাত করিতেছে এবং এই আঘাত জনিত ধমনীর মধ্যে যে স্পন্দন হইতেছে তাহাকে Percussion Wave বা বায়ু নাড়ী বলা হয়। পরে হৃৎপিণ্ডের প্রসারিত (Diastab) হইবার সময় হৃৎপিণ্ডের সেমিলিউনার ভালভস্ হঠাৎ বন্ধ হওয়ায় ধমনীস্থিত রক্তকে পুনরায় হৃৎপিণ্ডের ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় না; হৃৎপিণ্ডস্থিত সেমিলিউনার ভালভসেতে রক্ত প্রবাহের প্রতিঘাতজনিত ধমনীর মধ্যে যে স্পন্দন হয় তাহাকেই Tiidal wave এবং কবিরাজী মতে পিত্তনাড়ী বলা হয়।

ভুক্তদ্রব্য আহারের পর পাকস্থলী ও অন্ত্রদ্বয় হইতে পাচক রস দ্বারা রূপান্তর ও

শোষিত হইয়া রক্তপ্রণালীমধ্যে রক্তে পরিণত হইয়া সর্ব্বশরীরে প্রবাহিত হয়। এই রক্ত হইতে শরীরস্থ যাবতীয় কোষসকল (tissue cells) পোষণ গঠন ও কার্য্যক্ষম হয় এবং উক্ত কোষসকলের পরিত্যক্ত অনাবশ্যকীয় পদার্থকে বহন করিয়া শরীর মধ্য হইতে মূত্র ঘর্ম্ম ও শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা নির্গত হয়। ইহাকেই metabalism কহে। এবং উক্ত অনাবশ্যকীয় পদার্থকে টক্সিন্ (toxin) বা বিষাক্ত পদার্থ বলে। এই টক্সিন ভ্যাসোমোটর স্নায়ু (ধমনী সকলের উপর যে সমস্ত স্নায়ু ক্রিয়া করে) কে উত্তেজিত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈরিক রক্তপ্রণালী সকলকে (cappilary blood vessels) সঙ্কুচিত করিয়া রক্তচাপ (Blood pressure) বৃদ্ধি করে। আবার যতই রক্তচাপ বৃদ্ধি হইবে, হৃৎপিণ্ড প্রেরিত রক্তর, রক্তপূর্ণ ধমনীতে যাইয়া হৃৎপিণ্ড প্রসারিত (Diastab) হইবার কালীন ধমনীস্থিত রক্তপ্রবাহের প্রতিঘাত যত জোরে হৃৎপিণ্ডস্থিত সেমিলিউনারভাল্‌ভ্ সেতে প্রতিহত হইবে। ধমনীর মধ্যে তত জোরে স্পন্দন হইবে, এই স্পন্দনই Tidal wave বা পিত্তনাড়ী। রক্তচাপ যতই বেশী হইবে প্রতিঘাতটীও ততই বেশী হইবে সুতরাং পিত্তনাড়ীও ততই প্রবল বা স্পষ্ট হইবে। রক্তচাপ যত কম হইবে প্রতিঘাতটীও ততই কম হইবে সুতরাং পিত্তনাড়ী ততই অস্পষ্ট বা অদৃশ্য হইবে। রক্তচাপ বৃদ্ধিহইলে শরীরের মধ্যে টক্সিন ও বেশী হইবে, আবার এই টক্সিন ভ্যাসোমোটর স্নায়ুকে সঙ্কুচিত করিবে, কাজেই রক্তপূর্ণ ধমনীতে যে পরিমাণে রক্ত প্রবেশ করিতেছে, তাহা অপেক্ষা কম রক্ত বাহির হইয়া যাওয়ায় রক্তচাপ বৃদ্ধি হইতেছে এবং পিত্তনাড়ী ততই প্রবল হইতেছে। শরীরের মধ্যে টক্সিন যতই কম হইবে, রক্তচাপ ততই কম হইবে পিত্তনাড়ী ততই অস্পষ্ট হইবে।

Dicratic wave বা কফনাড়ী। ফিজিওলজিক্যাল কারণ:—রক্তপূর্ণ ধমনীতে হৃৎপিণ্ড আবার প্রত্যেক সঙ্কোচনে (Systab) অতিরিক্ত ৩৪ আউন্স রক্ত প্রবেশ করাইয়া দিতেছে। উহাতে প্রথমে ধমনীর মধ্যে যে স্পন্দন হইতেছে তাহাকে percussoin weve বা বায়ুনাড়ী বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ হৃৎপিণ্ড প্রসারিত (Diastab হইবার কালীন ধমনীস্থিত রক্তপ্রবাহ হৃৎপিণ্ডের সেমিলিউনার ভালভ্ সেতে প্রতিহত হইয়া যে স্পন্দন হইতেছে তাহাকে tidat wave বা পিত্তনাড়ী বলা হয়। তৃতীয়তঃ রক্তপূর্ণ ধমনীতে হৃৎপিণ্ড প্রেরিত অতিরিক্ত রক্ত ধমনীর স্থিতি স্থাপকতার Elasticity) গুণ থাকায়, ধমনী সকল প্রসারিত হইয়া অতিরিক্ত রক্তকে স্থান দিতেছে এবং ধমনীর সঙ্কোচনের (Contraction) অবস্থায় যে স্পন্দন ধমনীতে পাওয়া যায়, তাহাকে D'eratic wave এবং কবিরাজী মতে তাহাকে কফ নাড়ী বলা হয়।

থোরাসিক্ ডাক্ট এবং দক্ষিণ লিফক্যাটিক্ ডাক্ট্ নামক দুইটী প্রধান শ্লৈষ্মিক প্রণালী শরীরস্থ যাবতীয় শ্লৈষ্মিক রস লইয়া সাবক্লেভিয়ান্ ভেন এবং জুগুলার ভেনের সংযোগ স্থলে যথাক্রমে বামে ও দক্ষিণে আসিয়া রক্ত প্রবাহতে মিলিত হইতেছে। কিন্তু রক্তচাপ কম থাকিলে শ্লৈষ্মিক রস অবাধে শ্লৈষ্মিক প্রণালী হইতে রক্ত প্রণালীতে মিলিত হইতে

পারে না। রক্তচাপ বেশী হইলে হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক সঙ্কোচনেতে শ্লৈষ্মিক প্রণালীর পশ্চাৎদিক হইতে চাপদ্বারা back ward pressure শ্লৈষ্মিক রস অবাধে আসিতে থাকে অধিকন্তু রক্তচাপ বেশী থাকায় শিরার রক্তচাপ দ্বারা শ্লৈষ্মিক প্রণালী হইতে শ্লৈষ্মিক রস এ্যাস্পিরেটিঙের aspirating দ্বারা রক্ত প্রণালী মধ্যে অবাধে আসিতে থাকে। কফ-নাড়ী বলিতে শরীরস্থ শ্লৈষ্মিক রসের গতি বুঝায় অর্থাৎ যখন রক্তচাপ কম থাকে তখন শ্লৈষ্মিক রস অবাধে শিরাতে আসিয়া পড়িতে পারে না, আবার রক্ত চাপ কম থাকার জন্য ধমনীর স্থিতিস্থাপকতার গুণ থাকার জন্য বেশী সঙ্কোচন Contraction হয়, ধমনীর যত বেশী সঙ্কোচন হইবে, ততই স্পন্দনটীও বেশী স্পষ্ট হইবে। রক্তচাপ বেশী থাকিলে ধমনী সকল অত্যন্ত Tension এতে থাকায় উহার স্থিতিস্থাপকতার গুণ কম হইয়া যায়। স্থিতিস্থাপকতার গুণ কম থাকায় উহার সঙ্কোচনও কম হয়, সুতরাং স্পন্দনও হইবে অর্থাৎ রক্তচাপ বেশী হইলে শ্লৈষ্মিকরস অবাধে রক্ত প্রণালীতে আসিয়া পড়িতে পারে, সুতরাং এখানে কফ নাড়ী অস্পষ্ট বা অদৃশ্য হইবে। শ্লৈষ্মিক রস দ্বারা যাবতীয় শরীরস্থ সেলের গঠন, পোষণ ও কার্য্যক্ষম হয়। যখন ইহার শ্লেষ্মাধিক্য হয় তখন সেলের ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়। যেখানে কফ-নাড়ী প্রবল সেখানে বুঝিতে হইবে যে শরীরস্থসেলের গঠন ও পোষণ ইত্যাদির ব্যাঘাত হইতেছে।

আয়ুর্ব্বেদ কি অবৈজ্ঞানিক ?

(শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ)

পাশ্চাত্য দেশের শ্বেত ঋষিরা এবং তথাকথিত শ্বেত উচ্ছিষ্ট ভোজী কৃষ্ণাবতারেরা মনে করেন সারা ভারতটাই অবিজ্ঞানিক। বিজ্ঞান আসিল পশ্চিম হইতে, তবে ভারত বিজ্ঞানের ছোঁওয়া ধরা পাবে কোত্থেকে? ইত্যাদি কথার গঞ্জনা আমরা শুনে শুনে মনে করি "হাঁ, ঠিকই আমরা বুঝি অবৈজ্ঞানিক, আমাদের আয়ুর্ব্বেদ ও অবৈজ্ঞানিক।" সুধীসমাজে গিয়া, বসে আরো লজ্জা হয় যে, আমাদের আয়ুর্ব্বেদে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর চিকিৎসা নাই, আয়ুর্ব্বেদে শল্য বা অস্ত্র চিকিৎসা নাই। এই শল্য চিকিৎসার অভাবই আয়ুর্ব্বেদকে আরো কাবু করিয়া ফেলিয়াছে। যখন পশ্চিমের সঙ্গে পূর্ব্বের তর্ক উপস্থিত হয়, তখন দূরের লোক আমরা এ ওর পানে মুখ চাওয়া চাওয়ি করিয়া তর্কের খতম করি।

বড় দুঃখ হয় আমাদের চরক, সুশ্রুত-নিদান কিছুই বিজ্ঞানের নাগ পায় নাই। আজ কাল দেশবাসীগণ একটু স্বাবলম্বন প্রয়াসী হইয়াছেন, তাই দেশবাসীরা একটু একটু চিকিৎসা বিজ্ঞানের তত্ত্ব অল্পাধিক পরিমাণে

রাখিতেছেন। পাশ্চাত্য প্রভাবে আমাদের দেশে এম্, ডি, এম, বি, এল, এম, এস প্রভৃতি বহু চিকিৎসক খাড়া হইয়াছেন। কিন্তু তাঁরা যে সেই পাশ্চাত্য প্রসাদ প্রার্থী, যদি বিদেশ হইতে ঔষধ না আসিত তবে তাঁহারা অস্ত্রহীন সেনানীর ন্যায় রণ ক্ষেত্রে কেবল শোভা বর্দ্ধনই করিতেন। তাঁদের দ্বারা আর কি কাজ সম্ভব হইতে পারিত ?

দেশের লোক চিকিৎসা সম্বন্ধে একবারে উদাসীন, এই নন্‌কো অপারেশনের দিনে দেশের লোক অন্ন বস্ত্র দেশ হইতে সংস্থান করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, কত দৌরাত্ম্য-অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন তাহার সীমা নাই, কিন্তু কই তাঁহারাতো দেশের স্বাস্থ্য, আরোগ্য লাভের সর্ব্বপ্রধান উপায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার জন্য একটুও মাথা ঘামাই-তেছেন না। বরং দেশের লোক এতটা উদাসীন যে, যে পাশ্চাত্য বিষে আমাদের দেহ জর্জ্জরিত হইয়াছে, তাহারই পুষ্টি বর্দ্ধনার্থে চেষ্টা করিতেছেন! আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা প্রণয়ণকারী ধন্বন্তরিগণ অনুমান, প্রত্যক্ষ, আপ্তবাক্য ও যুক্তি এই চারি প্রকার প্রমাণ লইয়া চিকিৎসার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদসৃষ্টির বহু সহস্র বৎসর গত হইলেও আয়ুর্ব্বেদের কোন কথাই অপ্রামাণ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইবার যোগ্য হয় নহে। আয়ুর্ব্বেদ, দেহী মাত্রের বায়ু, পিত্ত, কফ তিনটী ধাতুকে সার ধরিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদী পাশ্চাত্য ঋষিগণ ইহা বুঝিতে পারেন না বলিয়াই আমাদের আয়ুর্ব্বেদকে অবৈজ্ঞানিক বলিয়া থাকেন, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই ?

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কীটাণুর দোহাই দিয়া থাকেন। কীটাণুই সর্ব্বরোগের কারণ তাই কীটাণুর দোষ দিয়া থাকেন। ম্যালেরিয়া জ্বরে মশক কুল সর্ব্বধ্বংসী। তাই কীটাণুর ধ্বংসোদ্দেশে কুইনাইন নামক পদার্থ গাদা গাদা খাওয়াইয়া রোগীকে আধ-মরা করিয়া ছাড়িতেছেন, অবশেষ আয়ুর্ব্বেদে তাহার চিকিৎসা হয়—ইহাই আধুনিক সনাতন প্রথা। "জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং পথ্যং" ইহা আয়ুর্ব্বেদের কথা। জ্বর হইলে প্রথমে লঙ্ঘন, দ্বারা দেহ রসহীন করা, স্নানাদি রসকর বিষয় বর্জ্জন করা। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ একবারেই কীটাণুর কথা ভাবে না। সুতরাং অনেকেই মনে করিবেন যে, আয়ুর্ব্বেদে কীটাণুর কথা একবারেই নাই। মশক মারিবার জন্য সরকার নানা উপায়ে কামান পাতিয়াছেন, শিশি শিশি কুইনাইন দিয়া রোগীকে কীটাণু মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু দু'দিন পরেই আবার জ্বর বাহির হইতেছে। এটা কি? দেহে যাহাতে কীটাণু প্রবেশ করিতে না পারে বা প্রবেশ করিলেও নির্ম্মূল হইয়া যায়—ইহাই হচ্ছে আয়ুর্ব্বেদের বিধান। কীটাণু যাহাতে আর দেহপ্রবিষ্ট হইতে না পারে, এইরূপ চিকিৎসাই সঙ্গত। দেহে কীটাণু প্রবেশ করিবেই, কিন্তু দেহটাকে এমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে যে, কীটাণু প্রবেশ মাত্রেই ধ্বংস হইয়া যাইবে—ইহাই হচ্চে প্রকৃষ্ট পন্থা। কোনটা করিব? শরীরকে ব্যাধির অনুপযুক্ত করিব—যাহাতে

কীটাণু প্রবেশ করিতে না পারে তাহা করিব—না যথেষ্ট অত্যাচার করিয়া শরীরে কীটাণু প্রবেশ করাইয়া তাহার চিকিৎসা করিবার জন্য কীটাণু ধ্বংস করিব—কোনটা ইহার সমীচীন ব্যবস্থা—বুঝিতে পারি না।

বিগত এক বৎসর যাবৎ আমি ভীষণ হৃদপিণ্ডের বেদনায় ভুগিতেছি। ময়মনসিংহে আমার বাড়ী, সহরে আমায় বাসা বাড়ী। সেখানকার সহরের ছোট বড় পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ আমায় দেখিতেছেন, অবৈজ্ঞানিক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণও সকলেই উপস্থিত থাকিতেছেন। এম, বি, এল, এম্, এস রা ত আছেনই, মাসে মাসে সিবিল সার্জ্জনও আসিয়া দেখিতেছেন রোগের কিনারা হইল না। ইঞ্জেকসনও কম হয় নাই। কিন্তু কই কিছুতেইত উপশম হইল না, বুকের বেদনা জনিত কষ্ট এত বাড়িয়া গেল যে, দিবা রাত্রি নিদ্রা লোপ হইল, বসিতে বা শুইতে পারি না, সারা রাত্রি দুই জনের ঘাড়ে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকি। দিন মানেও বসিতে পারি না। প্রস্রাব করিলে, মলত্যাগ করিলে, আহার করিলে বেদনা প্রবলতর হইয়া যাতনা দেয়। মল মুত্র ত্যাগ করিতে হইলে অপরের বিশেষ সাহায্য ব্যতীত ফিরিয়া আসিতে পারি না। মল, মুত্র ত্যাগ করিয়া ফিরিবার সময় একটা পিঁড়ি বা চৌকিতে করিয়া দুইজনকে ধরা ধরি করিয়া ঘরে আনিতে হয়। এই ত তখন আমার অবস্থা। তৎকালে একজন বলিষ্ঠ ভৃত্য আমার সহায়ক স্বরূপ থাকি।

এই অবস্থায় আমি আমারনানা স্থানের তার কয়জন অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসক বন্ধুর শরণাপন্ন হই। সকলেই আমাকে অতি যত্নে অবিলম্বে ঔষধ পাঠাইয়াছিলেন, এখানে বলিয়া রাখা ভাল, ইতিপূর্ব্বে ময়মনসিংহের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের চিকিৎসাধীন কিছুদিন থাকিয়া কোন ফল পাই নাই। তৎপরই অন্যান্য স্থানের ঔষধ আসিয়া পঁহুছিল, সকলের ঔষধই অতি বিশ্বাস সহকারে ক্রমে ব্যবহার করিলাম, কিন্তু ভাগ্যক্রমে ইহাতেও বিশেষ ফল ফলিল না, তখন কলিকাতা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতেছি। ইহা যে চিকিৎসা যাত্রা তা' মনে করি নাই, গঙ্গা যাত্রাই ভাবিয়াছি, ময়মনসিংহের ডাক্তার কবিরাজগণ বলিলেন, "এরূপভাবে যাওয়া চলে না', নড়া চাড়ায় পীড়া বাড়িবে, হয়ত বা পথেই প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়া যাইবে।' সুতরাং আপাততঃ বাহির হওয়া স্থগিত রাখা গেল, পরে পরামর্শ হইল—বাড়ীশুদ্ধ সকলকে লইয়াই কলিকাতা যাত্রা করিব। আমি ভাবিলাম ভালই হইল, গঙ্গা যাত্রা কালে সবটিকে দেখিয়া মরিতে পারিব। কলিকাতায় বাড়ী ভাড়ার জন্য লিখিলাম, এক জন কবিরাজ বন্ধু লিখিলেন—', ভাড়ার বাড়ীর দরকার নাই, আমার বাড়ীতেই সপরিবারে উঠিবেন।" এই সময় হঠাৎ মনে হইল, রাজসাহীতে একজন কবিরাজকে পত্র লিখিয়া দেখিনা কেন? অবস্থা লিখিয়া পত্র দিলাম, তিনিও অতি সত্বর ঔষধ পাঠাইয়া দিলেন। ঔষধ আসিল, পরে বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসকেরা এ ঔষধ খাইতে নিষেধ করিলেন। তাঁদের কথা এই—"আমরা রোগ ও রোগী দেখে ঔষধ দিয়ে কিছু কর্ত্তে

পারলেম না। আর তিনি রোগ ও রোগী না দেখে শুধু জল ঔষধ দিলেন, তা'তে কি ফল হ'বে ? তাঁরা ঔষধ খাইতে বারণ করিলেন, তদনুসারে রাজসাহীতে কবিরাজ মহাশয়কে লিখিলাম। তদুত্তরে তিনি লিখিলেন—"আপনি ঔষধ খাউন, কাহারো কথা শুনিবেন না, অন্যে বুঝিতে পারেন নাই বলেই নানা কথা বলিতেছেন, এই ঔষধেই ফল পাইবেন। আমি তাঁহার কথা শুনিয়া ঔষধ খাইলাম, মন্ত্রশক্তির মত ফল পাইলাম, তিন মাস নিদ্রা কাহাকে বলে জানিতাম না। ঔষধ খাওয়ার প্রথম দিনই গভীর রাত্রে আমার নিদ্রা হইল, পরদিন এত সুখ পাইয়াছিলাম যে সাত রাজার ধন আনিয়া দিলেও এতটা সুখী হইতাম না। দ্বিতীয় দিন ঔষধ খাইয়া আরও খানিকটা বেশী ঘুমাইলাম, এসময় গাঢ় নিদ্রা হইল। শুশ্রূষা কারীর ঘড়ী ধরাই ছিল। দ্বিতীয় দিন বসিয়া বসিয়া কাটাইতে পারিলাম। সামনে কয়েকটা বালিশ রাখিয়া নিদ্রা গেলাম, বেদনার বেগও অনেকটা প্রশমিত হইল, মনে হইল যেন রোগ অর্দ্ধেক হইয়াছে। ডাক্তারেরা পরদিন আসিয়া দেখিলেন, আমি চেয়ারে বসিয়া আছি, কোথায় আমি সর্ব্বদা দাঁড়াইয়া থাকিতাম, আজ কিনা বসিয়া আছি, তাঁহারা অবাক হইয়া কহিলেন, "এ কিসে হইল ? আমি কহিলাম "এ আমাদের অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসার ফল।" তাঁহারা সব কথা শুনিয়া পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিলেন।

এবার তৃতীয় দিনের কথা, তৃতীয় দিন ঔষধ খাইয়া রাত্রে প্রায় তিন ঘণ্টা নিদ্রা যাইতে পারিলাম। এদিন কিন্তু শুইয়াই নিদ্রা গেলাম। প্রাতে উঠিয়া ভাবিলাম যেন আমি সম্পূর্ণ নীরোগ হইয়াছি, তাড়াতাড়ি মুখে জল দিয়া রাস্তার বাহির হইয়া পড়িলাম। শুশ্রূষাকারীরা জাগিয়া উঠিয়া আমার পিছন ধরিল, আমি বলিলাম, "তোমরা কেন সঙ্গ লইতেছ, আমিত নীরোগ হইয়াছি মনে করিতেছি ?" তবুও তাহারা আমার পিছন ছাড়িল না। আমি একটু হাওয়ায় বেড়াইয়া গৃহে ফিরিলাম। আমার এই অবস্থা ঔষধ বা মন্ত্রবলে হইল তাহা আমিও বুঝিতে পারিলাম না। এই সময় আবার সমস্ত বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকগণকে ডাকিয়া পাঠাইলাম, সিবিল সার্জ্জনকেও ডাকিতে ভুলিলাম না। তাঁহারা আমাকে দেখিয়াত অবাক। তাহারা বলিলেন—"হায় আমরা কি অপদার্থ, এইরূপ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাকে আমরা আবার অবৈজ্ঞানিক বলিয়া নিন্দা করি, আমাদের মনে হয় আমাদের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ফেলে দিয়ে অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসকের নিকট গিয়া অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসক হইয়া আসি। ছাই এ সব, ফেলে দিতে ইচ্ছা হয়।" আমি যে চিকিৎসকের কথা লিখিতেছি তিনি প্রায় অশীতিপর বৃদ্ধ, এযুগে ধন্বন্তরি সদৃশ। আমি তাঁহার ঔষধ এখনও খাইতেছি, সম্পূর্ণ নিরাময় না হইলেও তাঁহারই ঔষধে বাঁচিয়া আছি, রোগের সামান্য মাত্র অবশিষ্ট আছে, একবার তাঁহাকে দেখাইয়া আসিয়া কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে কিছু দিন বাস করিয়া আসিব।

পথ্য তিনি অভিনব প্রকারের ব্যবস্থা করিয়াছেন, ভাত খাওয়া নিষেধ, ভাত খাইলেই বেদনা বাড়ে, তাই ভাত খাইনা, জল

একবারেই খাইতে নাই, পাতলা দুধ পরিত্যাজ্য। কতকদিন জল পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, জলের পরিবর্ত্তে ডাবের জল ও ছানার জল খাইতাম, এখনও প্রত্যহ লুচি খাইয়া আছি। ছানা ও ছানার জল নিত্য পথ্য। টক খাইতে নিষেধ নাই, প্রত্যহ দধি, ঘোল খাই। এখনও মল, মূত্র ত্যাগের পরও হাঁটিলে, পরিশ্রম করিলে বেদনা অনুভব করি। পেটে কিছু পড়িলেই বেদনা বাড়ে। ভুরি ভোজন করিলেত যাতনার সীমা থাকে না। কবিরাজ মহাশয় ধন্বন্তরি সদৃশ গঙ্গাধর কবিরাজের ছাত্র, তিনি শল্য বা অস্ত্র চিকিৎসা উত্তম রকম জানেন, চক্ষু চিকিৎসায় তিনি পারদর্শী, চক্ষুর অস্ত্র চিকিৎসা তিনি যেমন করেন এমন আর দ্বিতীয় দেখা যায় না। কে বলে আয়ুর্ব্বেদে অস্ত্র চিকিৎসায় নাই? তাঁহার অস্ত্র চিকিৎসা প্রণালী ও অন্যান্য অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য্য চিকিৎসা দেখিলে অবাক হইতে হয়। এইত আমাদের অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ও চিকিৎসকের অবস্থা। আয়ুর্ব্বেদকে অবৈজ্ঞানিক বলিতে বিজ্ঞান অভিমানী চিকিৎসকদের লজ্জিত হওয়া উচিত। এই ঘোরতর ননকোঅপারেশনের দিনে আপন পর চিনিয়া লওয়া সকলেরই উচিত। আয়ুর্ব্বেদকে দেশের ফুলের মাল্য দিয়া সাজাইয়া তোল।

—•—

পরমায়ু-প্রসঙ্গ বা মানুষ মরে কেন?

[কবিরাজ শ্রীঅক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ, ধন্বন্তরি]

দারোপগমন-বিধি।

——:•:——

পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।

জগদীশ্বর জগতে জীব-প্রবাহ প্রবহমান রাখিবার প্রয়োজনে জীবোৎপত্তির এক কৌশল পূর্ণ অতি চমৎকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সর্ব্বশ্রেণী জীবেই স্ত্রীজাতি ও পুরুষজাতি এই দুই প্রকার বিভাগ তাঁহার সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। সন্তানোৎপাদনের অনুকূল কতকগুলি ব্যাপার পুরুষ জাতিতে নিহিত এবং গর্ভ ধারণের উপযোগী কতকগুলি বিষয় স্ত্রীজাতিকে ন্যস্ত করিয়া উঁহাদের পরস্পর সংসর্গ দ্বারা বংশ-বর্দ্ধনের যে প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন; সেই প্রথা যে অতীব সমীচীন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। আবার উক্ত স্ত্রীপুরুষে যে সময়ে সময়ে রিরংসু হইবে, তন্নিমিত্ত উঁহাদিগের অন্তরে কামশক্তি প্রদান করিয়াছেন। সেই কামশক্তি

প্রণোদিত হইয়াই স্ত্রী-পুরুষে মিথুন ক্রিয়ায় নিরত হয়, এবং তদ্বারা গর্ভোৎপত্তি ও কালান্তরে অপত্যলাভ হইয়া থাকে।

যাবতীয় জরায়ুজ এবং দুই একটি ব্যতীত প্রায় সমগ্র অণ্ডজ জীবেরই মিথুন সংসর্গে সন্তানোৎপত্তি হয়। পশু পক্ষী প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রাণী সকলকে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে কাম ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। যে সময়ে গর্ভোৎপত্তির সম্ভাবনা, কেবল সেই সময়েই একজাতীয় স্ত্রী কামুকী হইয়া স্বজাতীয় পুরুষের সংঘর্ষ কামনা করে। তৎকালেই পুরুষজাতির স্ত্রীজাতির সহিত সঙ্গত হয়, অন্য কালে কখনই মিলিত হয় না। স্ত্রীজাতির গর্ভ গ্রহণের অযোগ্য সময়ে কিংবা তাহাদের কামনা-হীন অবস্থায় অন্তজ জাতীয়পুরুষ কদাপি স্ত্রীর নিকটবর্ত্তী হইতেও ইচ্ছা করে না; যদি দৈবাৎ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই স্ত্রীজাতি কর্ত্তৃক আহত ও বিতাড়িত হইয়া থাকে।

ঈশ্বর সৃষ্ট যাবতীয় পদার্থের মধ্যে মনুষ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মনুষ্যেতর নিখিল প্রাণী নিচয়কে তিনি একপ্রকার স্বাভাবিক জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, তাহারা যাবজ্জীবন সেই প্রকৃতি সিদ্ধ জ্ঞানেরই বশবর্ত্তী হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। কদাচ সেই সহজ জ্ঞানের বহির্ভূত কর্ম্ম করে না। পরন্ত মনুজবর্গকে তিনি হিতাহিত বোধাত্মকাশক্তি সমর্পণ পূর্ব্বক স্বাধীন ভাবে সঞ্চরণ করিতে আদেশ করিয়াছেন; অথচ তাহারা নামে মাত্র মনুষ্য হইয়া কার্য্যে পশুবৎ কদাচারী না হয় এ বিষয়েও বিলক্ষণ লক্ষ্য রাখিয়াছেন। আহার বিহারাদি দৈনন্দিন করণীয় কার্য্যে ভাব বর্জ্জন এবং শিবগ্রহণেই মনুষ্যের মনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মানব যে কোন কর্ম্মেরই আচরণ করুক না কেন, সর্ব্ববিষয়ে তাহাকে সুদৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিতে হইবে। সেই নিগড়চ্যুত হইলেই সংসারে নানা বিশৃঙ্খলার সংঘটন হয়। জন্মমৃত্যু মানবের প্রত্যবায়ের পরিণতি। দারোপগমন সম্বন্ধেও সেই ন্যায়োপেত নিয়মের অন্যথা নাই। সহধর্ম্মিণী সংসর্গেও তাহাকে শাস্ত্রীয় শাসন সমূহ অবশ্যই শিরোধার্য্য করিয়া চলিতে হইবে। নতুবা ইহকালে ও পরকালে তন্নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার কষ্ট ভোগ অনিবার্য্য। নারী-জাতি কুললক্ষ্মী, সংসারে শ্রী ও সমাজের ভূষণ স্বরূপ। অথচ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গের সহায়। পক্ষান্তরে আবার সেই সীমন্তিনীগণই ঘোরতর অলক্ষ্মী, গৃহস্থাশ্রমের সুতীক্ষ্ণ কণ্টক। যাবতীয় অনর্থের মূল, বহুবিধ বিপত্তির আধার এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গের সংহন্ত্রী। তজ্জন্য মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়াছেন :—

দিন কা মোহিনী রাত কা বাঘিনী
পলক পলক লহু চোযে।
দুনিয়া কা আদমী এ'সা বৌয়া হোকে
ঘর ঘর বাঘিনী পোযে॥

ইহার অর্থ এই রমণীগণ দিবা ভাগে মোহিনী মূর্ত্তিতে বিরাজমান থাকে বটে; কিন্তু রজনী যোগে তাহারা ব্যাঘ্রীর ন্যায় অল্প অল্প করিয়া মানবের শোণিত শোষণ করে।

মহাত্মা ও মহাসাধু তুলসী দাসের এই সদুক্তি যে মহা সত্য, এবিষয়ে কিঞ্চিৎমাত্র সন্দেহ নাই।

আর একটি সংস্কৃত শ্লোক আছে :-

রূপে তরুণ্যা ভয়ম্, কায়ে কৃতান্তাদ্ ভয়ম্।

এই শ্লোকের সমগ্র ভাগ উদ্ধৃতকরিলাম না। অভিপ্রেত অংশ মাত্র উদ্ধৃত করা হইল। ইহার অর্থ এই—রূপের ভয় যুবতীর কাছে, আর শরীরের ভয় যমের কাছে। অর্থাৎ তুমি যত বড়ই রূপবান, বলবান্ ও জ্ঞানবান হও বা কেন, প্রমদা প্রসঙ্গে তোমার মাতঙ্গাকার পতঙ্গের আকারে পরিণত হইবেই হইবে। পরম সন্ন্যাসী ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের এক শিষ্য তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন 'গুরো দ্বারং কিমেতন্নরকস্থ' ? অর্থাৎ গুরুদেব! নরকে যাইবার পথ কি ?

শঙ্করাচার্য্য উত্তর করিলেন—নারী, অর্থাৎ নারী জাতি নিরয় প্রাপ্তির সুপ্রশস্ত পথ।

শিষ্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—সংমোহত্যেব সুরেয়া কা ?" অর্থাৎ মদিরার মত কে মনুষ্যকে জ্ঞান শূন্য করে ?

গুরু উত্তর করিলেন—'স্ত্রী' অর্থাৎ প্রাণ প্রিয়া শীঘ্রই মানবকে মুগ্ধ করিয়া ফেলে।

শিষ্য পুনরপি প্রশ্ন করিলেন -'কিমত্র হেয়ম ?" অর্থাৎ এই পৃথিবীতে ত্যজ্য বস্তু কি ?

গুরু বলিলেন "কনককান্তা"—অর্থাৎ জগতে কামিনী ও কাঞ্চন এই দুইটি সর্ব্বাগ্রে পরিত্যাজ্য। মত্রচিত একটি সঙ্গীতে আছে – "ছাড় কামিনী কাঞ্চনের মায়া কর হরিনাম স্মরণ" ইহার ভাবার্থ এই যে, স্ত্রীপুত্রাদি ও অর্থাদির মায়া কাটাইতে না পারিলে ত আর উহাদের কোন উপায়ই নাই।

জিজ্ঞাসু শিষ্য পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন – "প্রভো ? এজগতে অতি বুদ্ধিমান ধীর প্রকৃতি ও প্রকৃত শান্ত ব্যক্তি কে ?

আচার্য্য সস্মিত বদনে উত্তর দিলেন—প্রাপ্তো ন মোহং ললনাকটাক্ষৈ' অর্থাৎ যে ব্যক্তি মনোমোহিনী মহিলার তির্য্যক দৃষ্টিতে কদাপি তির্য্যকত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, সেই যথার্থ জ্ঞানী; সেই প্রকৃত ধীর এবং সেই বাস্তবিক প্রশান্ত চিত্ত।

শিষ্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—'জ্ঞাতু ন শক্যং হি কিমস্তি সর্ব্বৈঃ ?"—অর্থাৎ ভূলোকে লোকে কোন জিনিসটি ঠিক জানিতে পারে না ?

উপাধ্যায় উত্তর করিলেন—যোষিন্মনো যচ্চরিতং তদীয়ম্'। অর্থাৎ অবনী মণ্ডলে অবলা জাতির অন্তঃকরণ অতি দুর্জ্ঞেয়। জানা বড় কঠিন। তজ্জন্য মনুষ্য সহস্র প্রকারে আয়াস স্বীকার করিয়াও স্ত্রীজাতির মনের কথা কিছুতেই জানিতে পারে না। তাহাদিগের চরিত্র সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান দেবতাদিগের ও অসাধ্য। মানুষের ত কথাই নাই। তন্নিমিত্ত একজন কবি বলিয়াছেন—'পুরুষস্য ভাগ্যং স্ত্রিয়শ্চরিত্রং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। ইহার অর্থ এই—পুরুষের ভাগ্য এবং স্ত্রীর চরিত্র দেবতারাও জানিতে পারেন না, মানুষ ত কোন্ ছার ?

আমরা এ পর্য্যন্ত সুধাভাণ্ড স্বরূপ অথচ হলাহল সদৃশ যোষা জাতির সম্বন্ধে যাহা ব্যক্ত করিলাম, পাঠকবর্গ তাহা অবশ্যই অবগত হইয়াছেন। কিন্তু তৃতীয়াশ্রমীদিগের ত তাহাদিগকে পরিত্যাগের কোন উপায় নাই। আরও এক কথাও ত আছে—'হাম তো ছোড়তা হৈ', লেকেন কমলী তো] ছোড়তা নহি'। অর্থাৎ তুমিই না হয় ছাড়িলে, কিন্তু সে ছাড়িবে কেন ? ছাড়া ছাড়ি হইলেই বা সংসারের সত্তা থাকে কৈ ? এক্ষণে তবে

কর্ত্তব্য কি? তৎপক্ষে সৎপরামর্শ এই যে, তাহাদিগকে লইয়াও থাক, অথচ আত্মরক্ষণ বিষয়ে একেবারে 'ভেবা গঙ্গারাম' হইয়া থাকিও না। একটু যেন চৈতন্ত থাকে। এতৎ সম্বন্ধে আমরা নিম্নে অতি সামান্য গুটি-কতক কথা বিবৃত করিব। কারণ স্থানা ভাব।

ভাই! মদালসাদিগকে লইয়া মদন মন্দিরায় একেবারে উন্মত্ত হইও না। কারণ যদ্যপি সম্পূর্ণ বিভোর হইয়া আপনাকে অত্যধিক মাত্রায় কন্দর্পের শরে বিদ্ধ কর, তাহা হইলে পরমার্থের পথ তুমি নির্ণয় করিতে পারিবে না। ফলে তদ্দারা অত্যধিক পরিমাণে শুক্রক্ষয় এবং তন্নিমিত্ত অতি মাত্রায় অসৃক্ ক্ষয় ও অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে। সুতরাং পুরুষগণ যাহাতে অনঙ্গ রঙ্গে মজিয়া অবশেষে আপনারাই অনঙ্গ না হয়, সে বিষয়ে তাহাদিগের বিবেক রাখা আবশ্যক। আবার এস্থলে এতদর্থ প্রতিপাদক কয়েকটি শাস্ত্রীয় বিধি নির্দ্দেশ করিতেছি।

হিন্দু শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—ঋতুর চতুর্থাদি রাত্রিতে ভার্য্যাতে উপগত হইবে, ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, মাসে একবার মাত্র দারোপগমন বা স্ত্রীর সহিত মিলিত হওয়া উচিত।

একটি প্রচলিত কথা আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি :—

মাসে এক, বৎসরে বার।
এর কমেও যত পার॥

এই কথাটির দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, বৎসরে দ্বাদশ দিনেরও ন্যূন সংখ্যায় কামকুন্দন করিতে পারিলে সর্ব্বতোভাবেই শ্রেয়ঃ সাধন হয়। কিন্তু মাংসাসৃক্ পুষ্ট শরীরির পক্ষে এও অসম্ভব। এই জন্য শাস্ত্রকারগণ আরও কিঞ্চিৎ শিথিলতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

মহাত্মা সুশ্রুত লিখিয়াছেন :—

গ্রীষ্মকালে পঞ্চদশ দিবস অন্তর
এবং অপরাপর সময়ে রাসযাত্রায় বাসরত্রয়
মানব প্রমদা গমন করিতে পারে।

মহোদয় চরকাচার্য্য আবার গ্রীষ্মচর্য্যায় লিখিয়াছেন :—

কাননানি চ শীতানি জলানি কুসুমানি চ।
গ্রীষ্মকালে নিষেবতে মৈথুনাদ্ বিরতো নরঃ॥

ইহার অর্থ এই—মর্ত্ত্যগণ গ্রীষ্মকালে মৈথুনে বিরত থাকিয়া নিকুঞ্জকানন, শীতল পানীয় এবং সুগন্ধি কুসুম উপভোগ করিবে।

মহানুভব চরকের উক্তিতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নিদাঘে নিতম্বিনী সম্ভোগ না করা ভাল। কারণ আতপকালে সন্তাপাধিক্য বশতঃ প্রাণ আই ঢাই করিতে থাকে। তদুপরি নিধুবন সমিত পরিশ্রমে কলেবর অতি স্নিগ্ধ হইলে প্রাণী সমূহ অধিকতর বিকল হইয়া উঠিবে। তন্নিমিত্ত আয়ুঃক্ষতির সমধিক সম্ভাবনা।

মনুসংহিতায় লিখিত আছে :—

ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ স্বদার নিরতঃ
সদা।
পার্ব্ববর্জ্জং ব্রজেচ্চৈনাং তদ্ব্রতো
রতিকাম্যয়া॥

ইহার অর্থ এই—পুরুষ অপত্যাকাঙ্ক্ষী হইয়া ঋতুর চতুর্থ্যাদি নিশায় সমীপে গমন করিলে নিজ জায়াতেই নিরত থাকিবে। যদি

সাতিশয় রাগ বশতঃ কদাচিৎ ঋতু ভিন্ন কালেও মানবের কান্তা গমনে কাঙ্ক্ষা জন্মে, তাহা হইলে, দুইটি অষ্টমী, দুইটি চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি এই বাসর সপ্তক বর্জ্জনপূর্ব্বক দারাভিগমন করিবে। উল্লিখিত বিধি বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, সম্ভোগবিষয়ে যতই স্বল্পতা অবলম্বন করিবে, ততই স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারিবে। ইহার ফলে স্বীয় স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং ভাবী বংশধর সুস্থ সবল ও সুদীর্ঘজীবী হইয়া সংসারে সর্ব্ব সম্পদ সম্ভোগ করিতে পারিবে। আশা করি, পাঠকগণ ইহা অবশ্যই পালন করিতে পারিবেন। অতঃপর অতিরিক্ত স্ত্রীপ্রসঙ্গের দোষ সকল সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যাইতেছে।

সুধীবর মহাত্মা সুশ্রুত লিখিয়াছেন :—

আত্মবান্ ব্যক্তি অতিরিক্ত যোষিৎসংসর্গ হইতে আপনাকে রক্ষা করিবেন। কারণ, উহাতে শূল, কাস, শ্বাস, জ্বর, পাণ্ডু, যক্ষ্মা এবং আক্ষেপাদি নানা ব্যাধির সৃষ্টি হয়। আবার উহা দ্বারা শরীর সাতিশয় শীর্ণ হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বকালে ব্রহ্মচর্য্যের প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বেই পরিব্যক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ বীর্য্য সংরক্ষণ, অর্থাৎ স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আদৌ শুক্রক্ষয় না করা। বিশিষ্ট চেষ্টা এবং নিরন্তর সাবধানতা অবলম্বন পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় সংরক্ষণের জন্য শাস্ত্রকারগণ যে সমুদয় পীযুষোপম উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ এ স্থলে বিবৃত হইতেছে।

সাক্ষাৎ প্রজাপতিকল্প মহাত্মা মনু লিখিয়াছেন :—

সর্ব্বত্র একাকী অধঃশয্যার শয়ন করিবে। কদাপি নিজ ইচ্ছায় রেতঃ স্খলন করিবে না। যে হেতু স্বেচ্ছায় বীর্য্য পাতনে স্বীয় ব্রহ্মচর্য্যের হানি হয়, এবং ইহার জন্য যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত করিবার পদ্ধতি আছে।

স্বেচ্ছায় রেতঃপাত করার নামান্তর হস্তমৈথুন, এবং অনিচ্ছায় সুপ্তিযোগে রেতঃচ্যুতি হইলে, তাহাকে সুপ্তিস্খলন বা স্বপ্নদোষ বলে। হস্ত মৈথুন অতি সাংঘাতিক রোগ। উহার দোষ যে কত, এবং উহার পরিণাম যে কিরূপ ভীষণ, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। বাল্যকালে বালকেরা সঙ্গদোষে পড়িয়া এই কদভ্যাসে রত হয়, এবং যাবজ্জীবন শরীরকে একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। এই বীভৎস কদাচার সম্বন্ধে আর অধিক লেখনী চালনা করিয়া আমরা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না; সংক্ষেপে যাহা কথিত হইল। তাহাতেই পাঠকগণ ইহার মারাত্মকত্ব প্রণিধান করিয়া সাবধান হইবেন।

এইবার সুপ্তিস্খলন বিষয়ে শাস্ত্রে কি প্রকার ব্যবস্থা আছে, উহাই উল্লিখিত হইতেছে।

মনু সংহিতায় লিখিত আছে :—

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও ব্রহ্মচারীদিগের যদি সুপ্ত অবস্থায় রেতঃস্খলন হয়, তাহা হইলে, স্নানান্তর 'পুনর্মাম্ এতু ইন্দ্রিয়ম্' অর্থাৎ আমার বীর্য্য পুনর্ব্বার আমাকে প্রাপ্ত হউক; এই মন্ত্র জপ করিবে। ইহাই এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

মুসলমানদিগের মধ্যে নিয়ম আছে, সুপ্তি স্খলন হইলে, তখনই (রাত্রিতেই) স্নান করিয়া যথাসাধ্য খোদাতালার নাম আওড়াইবে। পূর্ব্বে যাহা ব্যক্ত হইল, তাহাতে পাঠকগণ অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন যে,

য়েতঃ সংরক্ষণ ব্যাপারে মনুষ্যকে বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। তাহাতে বিশেষ ফল পাইবেন।

পাঠক, দেখুন, পরমায়ুর ক্ষতি বা বৃদ্ধি সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, সেই গুলিই শরীর রক্ষার উপায়। এই নিয়মগুলি অবশ্যই মানিয়া চলিতে হইবে। অন্যথা করিলে চলিবে না। যদ্যপি না মানেন, তাহা হইলে আপনাকে অকালে কালকবলে কবলিত হইতে হইবে। তাহাতে আর সংশয় থাকিবে না।

(ক্রমশঃ)

—•—

পিঁপুল।

পিপ্পলী, পিঁপুল, হিং পীপর্।

[কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন]

পিপ্পলী চারি প্রকার, পিপ্পলী (পিঁপুল), গজ পিপুল, সিংহলী ও বন পিপুল। পল্লীগ্রামে বনপিঁপুল প্রায় দৃষ্ট হইয়া থাকে, উহার মূল ঔষধার্থ ক্বাথে ব্যবহৃত হয়। মূলের গুণ বিরেচক।

যে পিপুল বেনের দোকানে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই সর্ব্বদা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কাসে পিঁপুল। গব্য ঘৃতে পিপুল ভাজিয়া কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ সহ সেবন করিলে কাসের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। পিপুল চূর্ণ; সৈন্ধব লবণ ও কিঞ্চিৎ মিশ্রীর গুঁড়া একত্র মধুর সহিত অবলেহ করিলে কাসের উপশম হয়।

জ্বরে পিঁপুল। পিঁপুল জ্বরঘ্ন ; জ্বর রোগে পিপুল চূর্ণ সহপানে ঔষধ প্রয়োগ করিলে জ্বরের লাঘব হইয়া থাকে, বালকের সর্দ্দিকাসি হইলে গব্য ঘৃতের সহিত একটী পিপুল জাল দিবে, ঐ ঘৃত পানে সর্দ্দিকাসির উপকার দর্শে। বালকের উদরাময় রোগে ছাগ দুগ্ধের সহিত একটী পিঁপুল ও ২।৩টী মুথা একত্রে জাল দিয়া ঐ দুগ্ধ সেবন করাইবে।

প্রবাহিকারোগে পিঁপুল। পিঁপুল চূর্ণ ঘোলের সহিত সেবন করিলে প্রবাহিকা রোগের উপশম হয়।

ইক্ষুগুড়ের সহিত পিপুল চূর্ণ সেবন করিলে কাস, অজীর্ণ, শ্বাস, হৃদরোগ, কামলা, অজীর্ণ, অরোচক, পাণ্ডু ও পুরাতন জ্বর বিনষ্ট হয়। পিপুল চূর্ণ ৵০ আনা, ইক্ষু গুড় চারি আনা।

প্রসূতির স্তন্য বর্দ্ধনার্থ পিঁপুল। গোলমরিচ এক আনা, পিঁপুল এক আনা, গব্য দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া ঐ দুগ্ধ পান করিলে স্তন্য দুগ্ধ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

পিপ্পলী প্লীহাজ্বর নাশক, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যে 'পিপ্পলী বর্দ্ধমান" ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা

আছে তাহা প্লীহা সংযুক্ত জ্বরে বিশেষ উপকারী।

রক্তপিত্তে পিপ্পলী। বাসক পাতার রসের সহিত পিপুল চূর্ণ ৪ রতি ও কয়েক ফোঁটা মধুসহ সেবন করিলে রক্তপিত্তের উপশম হয়।

শোথে পিপ্পলী। সর্ব্বাঙ্গ বা একাঙ্গগত শোথ রোগে গব্য দুগ্ধের সহিত পিপ্পলী সিদ্ধ করিয়া ঐ দুগ্ধ পান করিবে।

অম্লপিত্তে পিপুল। প্রত্যহ মধুসহ পিপুল চূর্ণ দুইআনা সেবনই করিলে অম্লপিত্ত রোগ প্রশমিত হয়।

পিপুল মূল। পিপুঁল মূল ইক্ষুগুড়ের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে সুনিদ্রা হইয়া থাকে।

পিঁপুল পত্রের রস বোলতা ও বিছা দংশিত স্থানে লাগাইলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণার উপশম হয়। পরিণাম শূলে পিপুল—

পিপুলের কাথ ও কল্কসহ ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে পরিণাম শূল নিবৃত্ত হয়। ঐ ঘৃত পানান্তে দুগ্ধ পান করিবে।

পিপ্পলী অগ্নিবর্দ্ধক, কফনাশক বাত শ্লেষ্মা জ্বর নাশক।

—:—

ক্ষিপ্ত কুক্কুর দংশনের ঔষধ।

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়]

১। কাল ধুতুরার পাতার রস (অভাবে সাদা অথবা কনক ধুতুরার পাতার রস) ১ তোলা, গব্য ঘৃত ।০ চারি আনা, কাশির চিনি ।০ চারি আনা, দধি ২ দুইতোলা একত্রে মিশাইয়া বৈকালে রোগীকে পান করাইতে হইবে। প্রাতঃকালে ভাত পাক করিয়া তাহাতে জল মিশাইয়া রাখিবে এবং ঐ জল দেওয়া ভাত যে পরিমাণে খাইতে পারে তাহাতে দধি মিশাইয়া সন্ধ্যার সময় খাইবে, কিন্তু লবণ মিশাইবে না। রাত্রে যে ঘরে রোগী শয়ন করিবে সেই ঘরে লোক থাকার প্রয়োজন ও নেশায় রোগী যেন ঘরের বাহির না হইয়া যায় এবং কোন উপদ্রব না করে, সাবধানে থাকিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে কোন প্রকার ভয়ের কারণ নাই। তৎপর দিন রোগীকে স্নান করাইয়া দধি-ভাত খাইতে দিবে। বৈকালে খাওয়ার সম্বন্ধে কোন প্রকার নিয়মের আবশুক নাই। জলাতঙ্ক উপস্থিত হইবার উপক্রম হইলেও এই ঔষধ তৎক্ষণাৎ খাওয়াইলে রোগী বাঁচিয়া যাইবে এবং দংশনের পর এই ঔষধ ব্যবহারে জলাতঙ্ক হইবে না। ঔষধ একবার খাইবার নিয়ম, কিন্তু ঔষধ খাইয়া বমন হইলে উহা দ্বিতীয়বার সেবন করাইতে হইবে। কুকুর কিম্বা শৃগাল দংশনের ৫।৬ দিন পরে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য।

২। যে কোন ধুতুরার রস ২ তোলা, ইক্ষু গুড় ২ তোলা, খাঁটি কাঁচা দুগ্ধ ২ তোলা, খাঁটি গব্য ঘৃত ২ তোলা মোট ৮ তোলা।

একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে হইবে। এই ঔষধ প্রাতে খালি পেটে সেবন করিতে হয়। সেবনে রোগীর মত্ততা জন্মে এবং তজ্জন্য সে পাগলের ন্যায় ব্যবহার করে। নিদ্রার পর রোগীর মত্ততা বিদুরিত হয়। ঔষধ সেবনের পর রোগীর অল্প মত্ততা হইলে তাহাকে স্নান করাইয়া সুক্তের ঝোল ও ঘোল দিয়া ভাত খাওয়াইবে। রাত্রিতে রোগীকে ডাল, ভাত, তরকারী, মাছ, দুধ সকলই খাইতে দিবে। কেবল মত্ততা দূর না হওয়া পর্য্যন্ত কোন মিষ্ট দ্রব্য খাইতে দিবে না। ধুতুরার পাতাগুলি ব্যবহারের পূর্ব্বে ধুইয়া শুষ্ক কাপড় দিয়া মুছিয়া লইবে এবং রস ছেঁকিয়া লইবে। ফল কথা ঔষধ সেবনের পর খুব মত্ততা জন্মিলেই বিষ নষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে। প্রথম দিন ঔষধ সেবনের পর মত্ততা কম হইলে কয়েক দিন পর আর একবার ঔষধ সেবন করাইবে।

৩। শ্বেত আকন্দ পাতার রস ১ ঝিনুক, কাঁচা খাটি দুগ্ধ ৵৹ পোয়ার সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে খালি পেটে খাইতে হইবে। বিষ থাকিলে বমি হইবে না। যে কয়দিন বমি না হয়, সে কয় দিন প্রাতঃকালে ১ বার করিয়া খাইবে, বমি হইলে বুঝিতে হইবে বিষ নাই, সুতরাং তখন ঔষধ সেবন অনাবশ্যক। এই স্থলে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে শয্যা হইতে উঠিয়া জল স্পর্শ না করিয়া উপরি উক্ত গাছের পাতা সংগ্রহ করিতে হইবে, রোগীও সেবনের পূর্ব্বে জল স্পর্শ করিবে না। উপরি উক্ত ১।২।৩ নং ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি ইহা ফলপ্রদ।

৪। ধুতুরার মূল।৹ চারি আনা, আকোড় গাছের মূল।৹ আট আনা বা বাঁশের মূল॥৹ আট আনা—দুগ্ধে পেষণ করিয়া প্রাতে খালি পেটে খাইলে কুকুর বিষ নষ্ট হয়।

৫। কুকুর কামড়াইবা মাত্র ধুতুরার শিকড়।৹ চারি আনা ২॥টা গোলমরিচ দিয়া বাটিয়া খাওয়াইলে বিষ নষ্ট হয়। প্রাতঃকালে খালি পেটে খাইবে।

৬। ধুতুরার মূল ২ রতি, সাদা পুনর্ণবার মূল।৹ চারি আনা বাটিয়া খাইলে বিষ নষ্ট হয়। প্রাতঃকালে খালি পেটে খাইবে।

৭। আপাং গাছের মূলসহ অগ্রভাগ ৸৹ বার আনা ওজনে লইয়া চিনিসহ বাটিয়া বড়ি করিবে ঐ বড়ি প্রাতঃকালে জল সহ সেবন করিলে বিষ নষ্ট হয়।

৮। কুন্দুরকি (কুঁদুরি) লতার মূল ২ তোলা বাটিয়া আদার রসের সহিত ভক্ষণে কুকুর দংশন জনিত উন্মাদ আরোগ্য হয়।

৯। কুচলে॥৹ আট আনা, ময়ূরপুচ্ছ।৹ চারি আনা ও তামা বা পিত্তলের গায়ের যে সবুজ ময়লা জন্মে তাহা ৵৹ দুই আনা একত্রে ঘুঁটের আগুনে পুটপাকে পোড়াইবে। পরে শীতল হইলে ঐ চূর্ণ ৬ ছয় রতি ঘৃত ও মধুর সহিত মাড়িয়া খাওয়াইলে বিষ নষ্ট হয়।

১০। মৌরী—মধুর সহিত বাটিয়া দংশন স্থানে প্রলেপ দিলে ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনজনিত ঘায়ের উপকার হয়।

১১। কুকুর, বিড়াল, শিয়ালাদির দংশনে ঘা হইলে "কালীঝাঁপের" পাতা বেটে দংশন স্থানে প্রলেপ দিলে ঘা আরোগ্য হয়।

১২। আকন্দ আটা, সরিষার তৈল, ইক্ষু গুড় সমভাবে মিশ্রিত করিয়া ক্ষতের উপর প্রলেপ দিলে ঘা শুকাইয়া যায়।

পথ্য। শুদ্ধ গব্য ঘৃত বা অল্প পরিমাণ অন্নের সহিত বেশী পরিমাণ গব্য ঘৃত মিশ্রিত করিয়া খাইলে বিষ নষ্ট হয়।

উপরি উক্ত ঔষধগুলির মাত্রা যুবক এবং বৃদ্ধদিগের জন্য। অল্প বয়স্ক বালকদিগের জন্য অর্দ্ধ কিম্বা সিকি মাত্রা ঔষধ গ্রহণ করিবে।—হিতবাদী।

আমাদের এই অনুষ্ঠান ইহার মধ্যেই সফলতার সম্মুখীন হইয়াছে এবং তজ্জন্য ইহা সাধারণের অনুকূল দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি এই বিদ্যালয়ে বাৎসরিক সাড়ে তিন হাজার টাকা দান করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া এই মহানগরীর উপকণ্ঠে শ্যামবাজারের বিস্তৃত পার্কের সম্মুখে এই বিদ্যালয়ের গৃহ-নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে এক বিঘা এগার কাঠা জমি দান করিয়াছেন। মার্টিন কোম্পানি এই গৃহ-নির্ম্মাণের ব্যয় হিসাবে প্রায় তিন লক্ষ টাকার এষ্টিমেট দিয়াছেন, ইহা ছাড়া বিদ্যালয়ের সংশ্রবে একটি উপযুক্ত হাসপাতাল খুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে। সর্ব্ব সাকুল্যে ব্যয় অনুমান ১০ লক্ষ টাকা। আমরা ইহার মধ্যেই ২ লক্ষ টাকার প্রতিশ্রুতি পাইয়াছি। যাহাতে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের উপাধি ও অনুষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত হয়, তজ্জন্য ও চেষ্টা চলিতেছে। মোট কথা বৃথা বাগাড়ম্বরে সময় ও উদ্যম নষ্ট না করিয়া এই বিদ্যা-বাটিকা ধীরে ধীরে শ্রীশালিনী হইয়া উঠিতেছে—ইহা সকলেই স্বীকার করিতেছেন। আমরা কার্য্যক্ষেত্রে এতটা অগ্রসর হইয়া সাধারণের নিকট সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইয়াছি। আমরা অনেকটা সাহায্য পাইয়াছি, এখন সাধারণ আমাদের প্রয়োজনীয় আর আট লক্ষ টাকার ভার গ্রহণ করুন! রাজা মহারাজা ও দেশের অপরাপর বড় লোকের রাজ প্রাসাদের দ্বারে আমরা যেমন উপস্থিত হইতেছি, তেমনই সাধারণ গৃহস্থের কুটিরের পার্শ্বেও আমরা মুষ্টিভিক্ষার প্রার্থনা করিতেছি। আমরা জানি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু লইয়া সমুদ্র, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণ লইয়া বড় বোঝা হয়; ক্ষুদ্রের সমষ্টিতেই বৃহতের জন্ম। জাতীয় অনেক অর্থ নানা বৃথা কার্য্যে জলের মত ব্যয় হইয়া যাইতেছে। এই মহৎকার্য্যে—আয়ুর্ব্বেদের উদ্ধার কল্পে বঙ্গবাসী অগ্রদূত হইয়া ঋষিদের মহাবাক্য ঘোষণা করুন—ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাঁহাদের নাম অক্ষয় করুন।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় এবং হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাকল্পে আমরা উদ্যোগী হইয়াছি বটে, কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, ইহা সাধারণের সম্পত্তি, সুতরাং ইহা আপনার নিজেরও সম্পত্তি। দেশের সকল বিষয়ের সংস্কারের সাড়া পড়িয়াছে, অধঃপতিত জাতির শক্তি সঞ্চয় করিতে হইলে তাহার জাতীয় চিকিৎসাকে সর্ব্বাগ্রে পুনরুদ্ধার করিবার আবশ্যক হইবে।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা অগাধ সমুদ্র বিশেষ। এই মহা সমুদ্রে যে সকল কৌস্তভমণি লুক্কায়িত, তাহা উদ্ধার করিয়া লইতে পারিলে বাঙ্গালী আবার যে স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘ-জীবন লাভ করিয়া পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়া পাইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

যস্ত দেশস্ত যো জন্ত তজ্জং তদৌষধং হিতম্।

যে দেশের প্রাণী তাহাদের রোগ নিবারণে সেই দেশজাত ঔষধই উপযোগী—ফলমূলাশি আর্য্য ঋষির ইহাই অমূল্য উপদেশ। আমরা এতদিন এ কথা বুঝি নাই বলিয়াই তো আমরা নানারূপ আধিব্যাধি প্রপীড়িত—নিত্য নূতন রোগাসুরগণকে বরণ করিয়া লইয়া ভগ্নস্বাস্থ্য ও অল্পায়ু হইয়া

উঠিয়াছি। এখন এই জাতীয় জাগরণের দিনে আমরা যাহাতে নষ্টস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রকৃত কর্ম্মী হইতে পারি,—আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে জাতীয় চিকিৎসা বিদ্যায় কৃতবিদ্য করিয়া আসুন, তাহারই উপায় বিধানে—এই কলেজ ও হাঁসপাতালের গৃহ নির্ম্মাণে অগ্রসর হই।

এই জীবন বেদ—আয়ুর্ব্বেদকে রক্ষা করিতে পারিলে অক্ষয় শিব প্রতিষ্ঠার ফল হইবে। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, অজীর্ণ, যক্ষ্মা—এখনকার দিনে বাঙ্গালীর নিত্য সঙ্গী। সত্যের অপলাপ না করিলে এ কথা মুক্ত-কণ্ঠে বলিব—সনাতন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা পুনঃ প্রচলিত হইলে এ রোগ কয়টি ব্যাপক-ভাবে তিষ্ঠিতে পারিবে না। কলেজ সংলগ্ন হাঁসপাতালে মফঃস্বলবাসী দুরারোগ্য রোগী-মাত্রেই যাহাতে স্থান পাইয়া সুচিকিৎসিত হইতে পারেন তাঁহার ব্যবস্থা করা হইবে। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া দেশকে রক্ষা করিবার জন্য আসুন, আমরা এই মহদনুষ্ঠানে কায় মনপ্রাণ অর্পণ করি, যাহার যেমন শক্তি এই সৎকার্য্যে নিয়োগ করিয়া ধন্যমনা হইতে চেষ্টা করি। এক পয়সা হইতে এক লক্ষ টাকা সমান আদরে গৃহীত হইবে। আর বেশী কিছু বলিবার নাই। শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি—সৎকার্য্যে বিঘ্ন অনেক; এই জন্য অতি সত্বর যাহাতে এই পরম কল্যাণকর কার্য্যটি সুসম্পন্ন হয়, দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার জন্য ব্যবস্থা করুন—ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

এই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের বোর্ড অব্ ট্রষ্টীর সভাপতি মাননীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী কে, টি, সি, এস, আই এবং কলেজ কাউন্সিলের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম, এ, এল, এম, এস ইহাও বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। আমরা অতি ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ দান—সকলই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।

কবিরাজ -শ্রীযামিনীভূষণ রায়
কবিরত্ন, এম, এ, এম, বি।

বৈদ্য-চিকিৎসা।

চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া চিকিৎসক হইতে হইলে চিকিৎসক কাহাকে বলে—সেই কথাটি প্রত্যেক চিকিৎসকের মনে রাখা উচিত।

শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন—

চিকিৎসাং কুরুতে যস্তু স চিকিৎসক উচ্যতে।

অর্থাৎ যিনি চিকিৎসা করেন, তাঁহাকেই চিকিৎসক বলা যায়।

তা'র পরেই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

স চ যাদৃক্ সমীচীন স্তাদৃশোঽপি
নিগদ্যতে॥

সেইজন্য যেরূপ চিকিৎসক সমীচীন—অর্থাৎ প্রশস্ত—তাহা বলা যাইতেছে।

তত্ত্বাধিগত শাস্ত্রার্থো দৃষ্ট কর্ম্মা স্বয়ং
কৃতী
লঘু হস্তঃ শুচিঃ শূরঃ সদ্যোঽপস্কর
ভেষজঃ।
প্রত্যুৎপন্নমতি ধীমান্ ব্যবসায়ী
প্রিয়ম্বদঃ।
সত্য ধর্ম্ম পরো যশ্চ বৈদ্য ঈদৃক্
প্রশস্যতে॥

অর্থাৎ যিনি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের তত্ত্ব সকল অধিগত অর্থাৎ আয়ত্ত করিয়াছেন,—দৃষ্টকর্ম্মা অর্থাৎ অন্যকৃত চিকিৎসা অনেক দেখিয়াছেন, স্বয়ং কৃতী অর্থাৎ নিজে চিকিৎসাকুশল হইয়াছেন, যিনি লঘু হস্ত, শুচি অর্থাৎ পবিত্রাচার সম্পন্ন, শূরঃ অর্থাৎ বলিষ্ঠ, যিনি নব প্রস্তুত ঔষধ সম্পন্ন, যিনি প্রত্যুৎপন্নমতি, যিনি ধীমান্, যিনি ব্যবসায়ী, যিনি প্রিয়ম্বদ এবং যিনি সত্য পরায়ণ ও ধার্ম্মিক তিনিই চিকিৎসক পদ বাচ্য।

অতএব দেখা যাইতেছে—চিকিৎসক হইতে হইলে শুধু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে চলিবে না, উপদেশ শুনিলে চলিবে না, চিকিৎসক হইবার জন্য কতকগুলি গুণ বিশিষ্ট হইলেও চলিবে না, সদ্যোঽপস্কর ভেষজ" হওয়া চাই—ঔষধ প্রস্তুতে সক্ষম হওয়া চাই—ঔষধের দ্রব্য চেনা চাই—আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মন্থন পূর্ব্বক সকল প্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিতে অভ্যস্ত হওয়া চাই—তবেই তিনি চিকিৎসক পদবাচ্য হইতে পারিবেন—নতুবা শুধু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া যিনি যত বড় অধ্যয়ন কুশল বলিয়া পরিগণিত হউন না কেন—যদি ঔষধ প্রস্তুত কার্য্যে অভিজ্ঞতা না থাকে তাহা হইলে প্রকৃত চিকিৎসক বলিয়া তিনি কখনই চিকিৎসক-সমাজে স্থান লাভ করিতে পারিবেন না।

এ সম্বন্ধে শাস্ত্রকার মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন—

যস্তু কেবল শাস্ত্রজ্ঞো ভেষজেষ্ব
বিচক্ষণঃ।
তং বৈদ্যং প্রাপ্য রোগীস্যাদ্
যথা নৌ নাবিকং বিনা॥

অর্থাৎ যিনি কেবল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, কিন্তু ঔষধ প্রয়োগে বিচক্ষণ নহেন, তিনি চিকিৎসা করিলে কর্ণধার বিহীন তরণীর ন্যায় সঙ্কটে পতিত হইয়া থাকেন।

আবার শুধু ঔষধ প্রস্তুত করিতে জানিলেও হইবে না—চিকিৎসা করিতে হইলে—চিকিৎসক হইতে হইলে—শাস্ত্র কুশলও হওয়াএকান্ত আবশ্যক। শাস্ত্রকার এ সম্বন্ধে বলিয়া গিয়েছেন।

ভেষজং কেবলং কর্ত্তুং যো জানাতি ন
চাময়ম্।
বৈদ্য কর্ম্ম সচেদ্ কুর্য্যাদ বধমর্হতি
রাজতঃ॥

অর্থাৎ যিনি কেবল ঔষধ প্রস্তুত করিতে জানেন, কিন্তু শাস্ত্র গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন নাই—তিনি যদি চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তিনি প্রাণদণ্ডার্হ

অপরাধে অপরাধী হইবেন ;—ইহাই সেকালে রাজার আইন ছিল।

এখন দেশকাল রুচি অন্যভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে যে রাজকীয় আইন ও এখন প্রচলিত নাই সত্য এবং তাহারই ফলে ঔষধ প্রস্তুতে অভিজ্ঞ হইয়া চিকিৎসা ক্ষেত্রে এখনকার দিনে সকল চিকিৎসক অবতীর্ণ হন না। হিন্দুর দেশে—হিন্দুর সর্ব্ব প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয়—আমাদের সনাতন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অবনতির কারণ ইহাই। ইহারই জন্য বিলাস কামনা শূন্য টিকিধারী—ফোঁটা কাটা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক সভ্যতায় পূর্ণমূর্ত্তি বিদেশীয় চিকিৎসকদিগের অনেকে পশ্চাতে আসন পাইয়া থাকেন। কি মান-সম্ভ্রম—কি অর্থ উপার্জ্জন—অনেক বিষয়েই যে এখন আমরা ডাক্তারদিগের সমকক্ষ হইতে সক্ষম হই না—ইহার কারণই আমরা যে ভাবে চিকিৎসা বিদ্যাশিক্ষা করা উচিত—চিকিৎসার মত জীবন-মরণের দায়িত্ব পূর্ণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে যে সকল উপাদান ও উপকরণ সকল আয়ত্ত করিয়া এরূপ কঠিন ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত—শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শাস্ত্রের প্রত্যেক অধ্যায়—প্রত্যেক ছত্র প্রত্যেক অক্ষরটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধিগত করিয়া, তাহার পর অস্তকৃত চিকিৎসার পদ্ধতি বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, ঔষধ প্রস্তুত কার্য্যে সম্পূর্ণ রূপে অভ্যস্ত হইয়া চিকিৎসা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি না। হিন্দু রাজত্বের অবসানে—মুসলমান নরপতিদিগের প্রাদুর্ভাবে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অবনতির সূত্রপাত এমনই করিয়াই আরম্ভ হইয়াছিল, সেই আরম্ভের পরিসমাপ্তিও সেই জন্য ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছে।

যাক্—এসম্বন্ধে অনেক কথা বলা যায়, এখানে আর সে সকলের আলোচনার আবশ্যক নাই. কেবল এই কথাটা একান্ত মনে রাখিতে হইবে যে, চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন ক'রতে হইলে যেমন গ্রন্থ অধ্যয়ন একান্ত প্রয়োজন, সেইরূপ ভেষজ কল্পনার শিক্ষাও একান্ত আবশ্যক। আমরা এইবার ভেষজ কল্পনার বিষয় কিছু আলোচনা করিব

ভেষজ লক্ষণে শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন,—

বৈদ্যো ব্যাধিং হরেদ যেন তত্রবং প্রোক্ত মৌষধম্।

অর্থাৎ চিকিৎসক যে দ্রব্য দ্বারা ব্যাধি হরণ করেন, তাহার নাম ঔষধ।

তত্র, যাদৃশমবশ্যং স্যাদ্রোগঘ্নং তাদৃশং ব্রুবে।

তাহার মধ্যে যে সকল ঔষধ প্রশস্ত ও রোগঘ্ন অর্থাৎ রোগ নিবারণে সমর্থ সেই সকল বলা যাইতেছে।

প্রশস্ত দেশ সঞ্জাতং প্রশস্তেহনি চোদ্ধৃতম্।
অল্পমাত্রং বহুগুণং গন্ধবর্ণ রসান্বিতম্॥
দোষঘ্ন গ্লানিকরমধিকং ন বিকারি যৎ।
সমীক্ষ্যকালে দত্তঞ্চ ভেষজং স্যাদ গুণাবহম্॥

অর্থাৎ প্রশস্ত স্থানে উৎপন্ন, প্রশস্ত দিবসে উদ্ধৃত; অল্পমাত্র অর্থাৎ অল্প পরিমিত, বহু গুণ বিশিষ্ট, উপযুক্ত গন্ধ, বর্ণ ও রস যুক্ত, দোষঘ্ন, যাহা গ্লানিকর বা অধিক বিকৃতিজনক নহে এবং যাহা উপযুক্ত সময়ে প্রযুক্ত হয়, সেইরূপ ঔষধই বিশেষ ফলোপদায়ক হয়।

যে ঔষধ নিজের জানা নাই, সে ঔষধ কখনও ব্যবহার করিতে নাই, শাস্ত্রকার সে সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন—

যথা বিষং যথা শস্ত্রং যথাগ্নিরশনির্যথা।
তথৌষধম বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম মৃতং যথা॥

অর্থাৎ যেরূপ বিষ, যেরূপ শস্ত্র, যেরূপ অগ্নি, যেরূপ অশনি—অজ্ঞাত ঔষধ সেইরূপ অনিষ্টকর এবং বিজ্ঞাত ঔষধ অমৃত সদৃশ।

যোগাদপি বিষং তীক্ষ্ণমুত্তমং ভেষজং ভবেৎ।
ভেষজং বাপি দুর্য্যুক্তং তীক্ষ্ণং সম্পদ্যতে বিষম্॥

যথাবিহিত যোগের দ্বারা তীক্ষ্ণ বিষও উৎকৃষ্ট ঔষধ হয় এবং দুর্য্যুক্ত ঔষধও তীক্ষ্ণ; বিষ সদৃশ হইয়া থাকে।

এই জন্যই শাস্ত্রকার মূর্খ ও কাণ্ডজ্ঞানহীন চিকিৎসক পদবাচ্য দিগের নিকট হইতে ঔষধ গ্রহণ করিতে একেবারে নিষেধ করিয়া বলিয়াছেন,

বরং দস্তো বরং ব্যালে বরং যাদো-বিভীষণে।
সাগরে জীবনোৎসর্গঃ সুঘোরে বাপি ধন্বনি॥
নাধীত শাস্ত্রেনাভ্যস্ত কর্ম্মস্তথিল বৈরিণি।
ন কার্য্যং দুর্ম্মতৌ পাপে ভিষজ্যাত্ম সমর্পণম্॥

বরং দস্যুর হস্তে, বরং হিংস্র জন্তুতে, বরং সর্পের মুখে; বরং নক্রাদি জলচর জন্তু সমাকুল ভীষণ সমুদ্রে অথবা ঘোরতর মরুভূমিতে প্রাণ বিসর্জন করাও কর্ত্তব্য, তথাপি অনধীত শাস্ত্র, অনভ্যস্ত কর্ম্মা, সর্ব্বজন বৈরী, দুর্ম্মতি ও পাপাত্মা চিকিৎসকের হস্তে আত্ম সমর্পণ করা কোনক্রমে বিহিত নহে।

পাচন চিকিৎসাও ভেষজ কল্পনার অন্তর্গত। পাচন চিকিৎসা চরকের চিকিৎসা। ইহা যেমন অল্পব্যয়সাপেক্ষ্য তেমনি সন্ত বিশেষ কার্য্যকরী। ভেষজ কল্পনা বলিলে অনন্ত আয়ুর্ব্বেদ জলধির তাবৎ ঔষধের কথাই বুঝায়, তাহাতে পাচনও বুঝায়, বটিকাও বুঝায়, চূর্ণ ও বুঝায়, অবলেহ ও বুঝায়, আসব ও বুঝায়, অরিষ্ট ও বুঝায়, প্রাশ ও বুঝায়, মোদকও বুঝায়, তৈলও বুঝায়, ঘৃত ও বুঝায়, কিন্তু পাচনের কথা বলিলে সেই ভেষজ সমষ্টির একটা অঙ্গের কথা বুঝায়। কিন্তু সেই ভেষজ সমষ্টির সকল অঙ্গগুলির মধ্যে পাচনের ব্যবহারে যেরূপ ফল পাওয়া যায়, সেইরূপ ফল অনেক ক্ষেত্রে অনেক ঔষধেও হয় না। মুষ্টিযোগ ও টোটকা পাচনেরই অন্তর্গত। আমাদের ভারতবর্ষ স্বর্ণপ্রসবিনী আখ্যা সমন্বিতা হইলেও ভারত মাতার সন্তান সমষ্টির অধিকাংশই দরিদ্র। সুতরাং দরিদ্রের রোগ নিবারণে ব্যয়ের লক্ষ্যও অল্প থাকা কর্ত্তব্য। একেতো পাচন-মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কার মত সদ্যফলপ্রদ ঔষধ আর, নাই তার উপর সেই সদ্যফলপ্রদ পাচন মুষ্টিযোগের ব্যয়ের পরিমাণ অতি সামান্য,—এমন কি অনেক সময় একটি পয়সা মাত্রও ব্যয় না করিয়া প্রত্যেক পল্লীবাসী গৃহস্থ পল্লী রত্ন প্রসূ প্রান্তর সকল হইতে সেই সকল পাচনের দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া অতি দুরারোগ্য ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন। এক সময়ে দরিদ্র বাঙ্গলা দেশের অবস্থা ইহাই ছিল। আয়ুর্ব্বেদের পূর্ণ বিকাশের যুগে দেশের এমন একটা অবস্থা